ভূমিকা

কবিতাগুলিকে কালানুক্রমিক সাজিয়েছি। যে-সব কবিতা ইতিপূর্বে কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি, তাদেরও এখানে—রচনার সময় অনুযায়ী—বিভিন্ন গ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত করে দেখানো হল। আশা করি, তাতে ধারানুসরণের সুবিধে হবে।

'এশিয়া' কবিতাটি হারিয়ে গিয়েছিল। কবি শ্রীশঙ্খ ঘোষ তাকে বিস্মৃতির অতল থেকে খুঁজে এনেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ তরুণ কবি শ্রীমৃণাল দত্তকেও। তাঁর সাহায্য না-পেলে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে আরও সময় লেগে যেত।

কবিতাগুলিকে যদি আমার ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসের ক্রমিক বিবর্তনের একটি অসম্পূর্ণ সূচিপত্র হিসেবে দেখা হয়, তা হলে খুশী হব।

এ ছাড়া, কবি ও কবিতা অভিন্ন বিধায়, এই গ্রন্থ সম্পর্কে আর-কোনও পরিচয়-সূত্র আমি পেশ করতে পারছি না। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চরিত্রের ভাষায় বলি, "...আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই।"

সূচিপত্র

নীরক্ত করবী

চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতিপূর্বে কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

কাঁচ-রোদ্দুর, ছায়া-অরণ্য

কাঁচ-রোদ্দুর, ছায়া-অরণ্য, হ্রদের স্বপ্ন।
আকণ্ঠ নিস্তেজ তৃপ্তি, ডোরাকাটা ছায়া সরল ;
বনে বাদাড়ে শত্রু ঘোরে,
তাজা রক্ত,— শয়তান অব্যর্থ।

ঝানু আকাশ ঝুঁকে পড়ে অবাক।
কাঁচা চামড়ার চাবুক হেনে
ছিঁড়ে টেনে খেলা জমছে :
এরা কারা, এ কী করছে ?
লোহা-গলানো আগুন জ্বলছে, সাঁড়াশি-
যন্ত্রণার দুঃস্বপ্ন।
আপ্রাণ চেষ্টায় জলের উপর মাথা জাগিয়ে
আকাশ ! আকাশ।
বাতাস টেনে শ্বাসযন্ত্র আড়ষ্ট।

এখন আবার মনে পড়ছে।
প্রান্তরে জরায়ু-ভাঙা রক্তভ্রূণ,
শকুন ! শকুন !
কয়েকবার পাখ্‌সাট মেরে ফের আকাশে উঠল।
করোটি, হাড়পোড়া, ধুলো—
চাপ চাপ জমাট রক্ত। ছায়ামূর্তি কে দাঁড়িয়ে ?
ধুলো, ধুলো। আমি ইয়াসিন,
পূরব-চটির হাটে যাব ; লাহেরীডাঙা ছাড়িয়ে
সে কত দূর। সেই এক ভাবনা ঘুরছে।
জল ! জল ! মরচে-পড়া চুল উড়ছে।

লোহামুঠিতে
ট্রাক্‌টরের হাতল চেপে তবু কখন ঝিমিয়ে পড়ল মন ;

কে গো তুমি মধ্যাহ্নের স্বপ্ন কাড়ো ?
আগুন-বাতাসে সূর্য কাঁপে, সন্ধ্যা নামবে কখন।

মস্তিষ্কের নিখুঁত ছাপ উঠল প্লাস্টারে।
রাত করেছে, এলোমেলো চিন্তা নিস্পন্দ।
পাহাড়ের শীত-হাওয়ায় খুলি ডুবিয়ে
তারা চলছে। ঘুমিয়ে পথ, যাত্রী।
আকাশ ভিজিয়ে অন্ধকার জ্বলছে,
আর
মরা অরণ্যে হঠাৎ-আগুন-লাগা ফানুসের চাঁদ উঠল,
রাত্রি।

২১ মাঘ, ১৩৫১

এশিয়া

এখন অস্ফুট আলো। ফিকে-ফিকে ছায়া-অন্ধকারে
অরণ্য, সমুদ্র, হ্রদ, রাত্রির শিশিরসিক্ত মাঠ
অস্থির আগ্রহে কাঁপে, আসে দিন, কঠিন কপাট
ভেঙে পড়ে। দুর্বিনীত দুরন্ত আদেশ শুনে কারো
দীর্ঘ রাত্রি মরে যায়, ধসে পড়ে জীর্ণ রাজ্যপাট ;
নির্ভয় জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে।
হে এশিয়া, রাত্রি শেষ, 'ভস্ম-অপমান-শয্যা' ছাড়ো,
উজ্জীবিত হও রূঢ় অসঙ্কোচ রৌদ্রের প্রহারে।

শহরে বন্দরে গঞ্জে, গ্রামাঞ্চলে, খেতে ও খামারে
জাগে প্রাণ, দ্বীপে দ্বীপে মুঠিবদ্ধ আহ্বান পাঠায় ;
অগণ্য মানবশিশু সেই ক্ষিপ্র অনিবার্য ডাক
দুর্জয় আশ্বাসে শোনে, দৃঢ় পায়ে হাঁটে। তারপরে

ভারতে, সিংহলে, ব্রহ্মে, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়
বীতনিদ্র জনস্রোত বিদ্যুৎ-উল্লাসে নেয় বাঁক।

১৩৫৪

ঢেউ

এখানে ঢেউ আসে না, ভালবাসে না কেউ, প্রাণে
কী ব্যথা জ্বলে রাত্রিদিন, মরুকঠিন হাওয়া
কী ব্যথা হানে জানে না কেউ, জানে না, কাছে পাওয়া
ঘটে না। এরা কোথায় যায় জটিল জমকালো
পোশাকে মুখ লুকিয়ে, ত্যাখো কত না সাবধানে
আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই, চেনে না কেউ সোনা ;
এখানে মন বড় কৃপণ, এখানে সেই আলো
ঝরে না, ভেঙে পড়ে না ঢেউ— এখানে থাকব না।

যে-মাঠে সোনা ফলানো যায়, আগাছা জমে ওঠে
সেখানে, এরা জানে না কেউ— কী রঙে ঝিলিমিল
জীবন,— তাই বাঁচে না কেউ ; দুয়ারে এঁটে খিল
নিজেকে দূরে সরায়, দিন গড়ায়। সেই সোনা
ঝরে না, ভেঙে পড়ে না ঢেউ— দুয়ারে মাথা কোটে,
এখানে মন বড় কৃপণ— এখানে থাকব না।

১৩৫৫

তৈমুর

রাজপথে ছিন্ন শব, ভগ্নদ্বার প্রাসাদে কুটিরে
নির্জন বীভৎস শান্তি। দলভ্রষ্ট আহত অশ্বের
চকিত খুরের শব্দ, মুমূর্ষুর আর্তকণ্ঠ, ফের
ভৌতিক স্তব্ধতা। শূন্য মসজিদের গম্বুজে খিলানে

রাত্রির নিঃসঙ্গ ছায়া নামে। প্রাণ-যমুনার তীরে
মৃত্যুর উৎসব সাঙ্গ, বিহঙ্গ-হৃদয় ছিন্নপাখা।
নগরে গ্রামে ও গঞ্জে মসজিদে মন্দিরে সর্বখানে
দুরন্ত তাতার-দস্যু তৈমুরের পদচিহ্ন আঁকা।

তৈমুর এখানে আসে দস্যুর মতন, জীবনের
কামনাকে হত্যা করে ; একটানা অদ্ভুত আহ্বানে
মৃত্যুকে সে ডাকে, তার লোভাতুর অতর্কিত টানে
ছিঁড়ে আসে প্রাণের মৃণাল, ত্রস্ত জীবনের স্বর
দুরন্ত আঘাতে থেমে যায়।— ভয়বিহ্বল মনের
সমস্ত কপাট বন্ধ, এসে পড়ে কখন তৈমুর।

৩ ভাদ্র, ১৩৫৫

ধ্বংসের আগে

তবে ব্যর্থ হোক সব। উৎসব-উজ্জ্বল রজনীর
সমস্ত সংগীত তবে কেড়ে নাও, নিত্য-সহচর
ব্যর্থবীর্য শয়তানের আবির্ভাব হোক। তারপর
পাতালের সর্বনাশা অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে
দৃঢ় হাতে টেনে দাও যবনিকা। নির্মম অস্থির
পদক্ষেপে আনো ভয়, বিস্বাদ বেদনা ঢেলে দাও ;
ঢালো গ্লানি, ঢালো মৃত্যু, শিল্পীর বেহালা ভেঙে ফেলে
অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে অট্টহাসি দু হাতে ছড়াও।

কেননা আমি তো শিল্পী। যে-মন্ত্রে সমস্ত হাহাকার
ব্যর্থ হয়, মজ্জামাংস জোড়া লাগে ছিন্নভিন্ন হাড়ে,
যে-মন্ত্রে উজ্জ্বল রক্ত নেমে আসে অস্থি-র পাহাড়ে,
প্রাণের রক্তিম ফুল ফুটে ওঠে মৃত্যুহিম গাছে,

সে-মন্ত্র আমার জানা,— তাই মৃত্যু হানো যতবার
যে জানে প্রাণের মন্ত্র, কতটুকু মৃত্যু তার কাছে।

২৩ শ্রাবণ, ১৩৫৬

শেষ প্রার্থনা

জীবন যখন রৌদ্র-ঝলোমল,
উচ্চকিত হাসির জের টেনে,
অনেক ভালবাসার কথা জেনে
সারাটা দিন দুরন্ত উচ্ছল
নেশার ঘোরে কাটল। সব আশা
রাত্রি এলেই আবার কেড়ে নিয়ো,
অন্ধকারে দু চোখ ভরে দিয়ো
আর কিছু নয়, আলোর ভালবাসা।

৯ ভাদ্র, ১৩৫৬

পূর্বরাগ

আরো কত কাল এ-ভাবে কলম ঠেলতে বলো,
আরো কত কাল সন্ধ্যাসকাল লেখা-লেখা খেলা খেলতে বলো

কত কাল, বলো— আরো কত কাল
দূরে থেকে আমি দেখব লুকিয়ে
রাতের প্রগাঢ় পর্দা সরিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে সোনালী সকাল
হিজলের ফ্রেমে ফুটে ওঠে শিশুসূর্যের মুখ ?
আলোর স্নিগ্ধ ঘ্রাণে উন্মন দু-একটা ছোট পাখি উড়ে যায়
মৃদু উৎসুক
চঞ্চল দুটি ছোট পাখা নেড়ে ;
মানুষেরা নামে মাঠে। পথেঘাটে বাড়ে কলরব ব্যস্ত হাওয়ায়।

বাড়ে রোদ্দুর, ডানা ঝাপটিয়ে
তেঁতুলের ডাল থেকে উড়ে যায় লোভী মাছরাঙা
হঠাৎ ছোঁ মেরে
নীল জলে তোলে ঢেউয়ের কাঁপন,
কাঁপে ঝিরিঝিরি বাতাসের শাড়ি, যেন ঘুমভাঙা
করুণকান্না বেদনার মতো ; অলস দুপুর
ধীরে ধীরে চলে গড়িয়ে, ছড়িয়ে
ক্লান্তির সুর।

চেয়ে ছাখো মন,

এই ক্লান্তি এ-শ্রান্তিকে ঘিরে আবার কখন
মন-কেড়ে-নেওয়া মায়াবী বিকেল বিছিয়েছে জাল
নিপুণ নেশায়, গেল গেল সব, ভেঙে গেল সব, উল্লাসে ঢালা
এই অরণ্য আবার, আবার ; শেষবার বুঝি
ভালবেসে নেবে। শিরীষে শিমুলে কথা চলে, আর
ডালে ডালে নামে লজ্জার লাল,
লাগে থরোথরো শিহরন, তার
কপালে তীব্র সিঁদুরের জ্বালা
জ্বলে ওঠে। ছাখো জ্বলে ওঠে সাদা ঝরোঝরো-শাখা ঝাউয়ের শিয়রে
তৃতীয়ার তনুতন্বী চাঁদের বঙ্কিম ভুরু
আকাশের কালো হৃদয়ে হঠাৎ।
মাঠে মাঠে নামে ছায়াছায়া ঘুম, সারারাত ধরে
আধো তন্দ্রার গলিঘুঁজি দিয়ে ম্লান ঝুরুঝুরু
হাওয়া হেঁটে যায়,
শিরশিরে শীতে কাঁপানো হাওয়ায়
চাঁদের তীক্ষ্ণ বঙ্কিম ভুরু কেঁপে ওঠে : যেন এই ধুধু মাঠ
মাঠ নয়, নদী নদী নয়, ঘুম ঘুম নয়, এই
মাঠ-নদী-বন যেন মিছিমিছি শুয়ে আছে, কেউ ফিরে তাকালেই
ডানা ঝাপটিয়ে একসার সাদা বকের মতন
উড়ে যাবে এরা। ভাবি, আর মনে ভয় নামে, নামে ধুধু সাদা ভয়
সারা মন জুড়ে ; মায়াবী কপাট

প্রাণপণে ঠেলি, পালাব। কোথায় পালাব? ধবল ছায়াছায়া ভয়
নেমে আসে, আর ম্লান চোখ নিয়ে চেয়ে থাকে মন,
মনের দীর্ঘ ছায়া বড় হয়।

এই-যে প্রথম সূর্যের সাড়া, উদাস দুপুর,
বিকেলের মধুমালঞ্চছায়া, রাত্রির থরোথরো শিহরন,
ছায়াছায়া ভয়, ঝরোঝরো-শাখা ঝাউয়ের শিয়রে
বাতাসের ছড়ে টেনে-যাওয়া ম্লান কান্নার সুর,—
বলো, এ কি শুধু নিজেকে লুকিয়ে
শুধু চোখে-দেখা দেখে যাব, আমি সকালের মন, দুপুরের মন,
রাত্রির মন খুঁজে দেখব না? শুধু ফাঁকি দিয়ে
চোখে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে যাব সব?
তা হলে আমি কি
কেউ নই? আমি সকালের নই, দুপুরের নই,
রাত্রিরো নই? তা হলে, তা হলে
এই-যে আকাশে প্রগাঢ় সূর্য সারাদিন জ্বলে
এই-যে রাত্রে লক্ষ হীরার চোখ-ঝিকিমিকি—
আমি তো এদের চিনি না। তা হলে
আরো কত কাল এভাবে কলম ঠেলতে বলো,
আরো কত কাল সন্ধ্যাসকাল লেখা-লেখা খেলা খেলতে বলো?

কত কাল, বলো আরো কত কাল
পারানির কড়ি ফাঁকি দেওয়া যাবে, সারাদিনমান
খেয়াঘাটে বসে এই মূঢ় আশা লালন করব?
এখনো যায়নি সময়, এখনো মন তুমি বলো—
নিজেকে গোপন রাখবার যত উদ্ধত আশা,
যা-কিছু গর্ব
সব গেল কিনা ভেঙেচুরে? হায়, হৃদয়ের সুরে
ম্লান ছলোছলো
কান্নাকরুণ মিনতির ভাষা

ফুটল না তবু, ফুটে উঠল না, তবু আজীবন
জীবনের সাথে, মৃত্যুর সাথে,
সকালের সাথে, রাত্রির সাথে
যে-মায়ারঙ্গে
মেতেছিলে তুমি, উচ্ছল ছয় ঋতুর সঙ্গে
নিজেকে লুকিয়ে যে-খেলায় তুমি মেতেছিলে, মন,
এখনো তাতেই মত্ত ? জানো না সে-খেলায় কার
জয় হল, কার শুধু পরাজয় ?

সকল অঙ্গে তীক্ষ্ণ প্রহার,
ম্লান ছলোছলো ঢেউ ভেঙে পড়ে, মনের দীর্ঘ ছায়া বড় হয়।

আমি তো রয়েছি নিজেকে নিয়েই মুগ্ধ, যাইনি
কোনোখানে, আমি বাড়াইনি হাত,
আলুথালু যত শিশুরা হঠাৎ
দু হাতে আমাকে জড়াল, আমি তো তাদের চাইনি—
তারাই চাইল আমাকে। কে জানে
দুটি প্রসারিত কোমল মুঠিতে সবকিছু এরা
কেন পেতে চায়, হেসে ওঠে কেন ; সে-হাসির মানে
কী, আমি কখনো ভাবিনি ; ভেবেছি
এই হাসিটুকু—
একে আমি গানে বেঁধে নেবো, তার সুর নিয়ে সারাদিন কাটাছেঁড়া
করেছি, ভরেছি গানে তাকে,— আজ
সে-গানের কী-যে মানে, তা তো আমি নিজেই জানি না।

জানি না হৃদয় চেয়েছিল কিনা
কখনো কাউকে। কোন্ সমুদ্রে গানের জাহাজ
সাধ করে ভরাডুবি হতে চায়, সে-কার কান্না
সারারাত ভরে শুনেছি, আমার মনে নেই তা তো।
কার রুখু-রুখু

ম্লান চুলে যেন বিষণ্ণ আশা ঝরে পড়েছিল, মনে পড়ে না তো।
তখন ভেবেছি, আমার গান না
যদি এই ঝরা হাহাকারটুকু
সুরে সুরে পারে বেঁধে নিতে তবে ব্যর্থ, ব্যর্থ
সবকিছু ; সেই হাহাকার— তার সুর নিয়ে সারাদিন কাটাছেঁড়া
করেছি, ভরেছি গানে তাকে,— আজ
যত গান তারা কোন্ কথা বলে,
সে-কথার কী-যে মানে, তা তো আমি নিজেই জানি না।

সারাদিন গান বাঁধবার ছলে
কিছু না চাইতে
জীবনের কাছে যেটুকু পেলাম,
ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যাবে না, হৃদয়, তারো পুরো দাম
দিয়ে যেতে হবে, নইলে সে-দেখা
কিছু না, সে-পাওয়া কিছু না। তা হলে
আরো কত কাল এভাবে কলম ঠেলতে বলো,
আরো কত কাল সন্ধ্যাসকাল লেখা-লেখা খেলা খেলতে বলো ?

৩ আষাঢ়, ১৩৫৭

একচক্ষু

কী দেখলে তুমি ? রৌদ্রকঠিন
হাওয়ার অট্টহাসি
দু হাতে ছড়িয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর
গ্রীষ্মের প্রেত-সেনা

মাঠে-মাঠে বুঝি ফিরছে ? ফিরুক,
তবু তার পাশাপাশি
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী তুমি
একবারো দেখলে না ?

একবারো তুমি দেখলে না, তার
বিশীর্ণ মরা ডালে
ছড়িয়ে গিয়েছে নম্র আগুন,
মৃত্যুর সব দেনা
তুচ্ছ সেখানে, নবযৌবনা
কৃষ্ণচূড়ার গালে
ক্ষমার শান্ত লজ্জা কি তুমি
একবারো দেখলে না ?

১৩৫৮

ফুলের স্বর্গ

যৌবনে আনন্দ নেই, যদি তার সমস্ত সম্ভার
আমৃত্যু অক্ষয় থাকে। ক্ষয়ে তার শান্তি, জীবনের
প্রার্থনা-পূরণ। এই অপরূপ প্রথম-গ্রীষ্মের
আলস্যের ভারে নম্র আদিগন্ত রৌদ্র-হাওয়া-নীলে
সামান্যই সুখ, দুঃখ অসামান্য ; সে-ঐশ্বর্যে তার
শুধু ব্যর্থ সঞ্চয়ের বিড়ম্বনা বাড়ে। এ-যৌবন
রিক্তই না হয় যদি, বঞ্চনায় বাঁচে তিলে তিলে,—
শান্তিও সান্ত্বনা তার, মৃত্যু তার সন্তাপহরণ।

সে-মৃত্যু যখনি নামে বিদ্যুৎবিদীর্ণ ঘন মেঘে
বৃষ্টির ধারায়, তুচ্ছ যৌবনজড়িমা লজ্জা সব ;

প্রাণের সমস্ত পাপড়ি মেলে তার দেবতাদুর্লভ
আলিঙ্গনে সংকোচের বৃন্ত থেকে খসে পড়ে যাওয়া—
সে-ই তো আমার স্বর্গ। প্রত্যাশায় সারারাত্রি জেগে
হাওয়ার হাততালি শুনি ; হাওয়া, হাওয়া— অফুরন্ত হাওয়া

২১ শ্রাবণ, ১৩৫৮

শিয়রে মৃত্যুর হাত

শিয়রে মৃত্যুর হাত। সারা ঘরে বিবর্ণ আলোর
স্তব্ধ ভয়। অবসাদ। চেতনার নির্বোধ দেয়ালে
স্তিমিত চিন্তার ছায়া নিবে আসে। রুগ্ন হাওয়া ঢালে
ন্যাসপাতির বাসী গন্ধ। দরজার আড়ালে কালো-টুপি
যে আছে দাঁড়িয়ে, তার নিষ্পলক চোখ, রাত্রি ভোর
হলে সে হারাবে।
সিঁড়ি-অন্ধকারে মাথা ঠুকে ঠুকে
কে যেন উপরে এল অনভিজ্ঞ হাতে চুপি চুপি
ভিজিট চুকিয়ে দিয়ে ম্রিয়মাণ ডাক্তারবাবুকে।

শিয়রে মৃত্যুর হাত। স্তব্ধীভূত সমস্ত কথার
মন্থর আবেগে জমে অস্বস্তির হাওয়া। সারা ঘরে
অপেক্ষার নিঃশব্দ জটলা। যেন রাত্রির জঠরে
মানুষের সব ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভাসিয়ে শূন্য সাদা
থমথমে ভয়ের বন্যা ফুলে ওঠে। ওদিকে দরজার
আড়ালে আবছায়া-মূর্তি সারাক্ষণ যে আছে দাঁড়িয়ে,
নিষ্পলক চোখ তার। নিরুচ্চার মায়ামন্ত্রে বাঁধা
ক্লান্তির করুণ জ্যোৎস্না নেমেছে শয্যার পাশ দিয়ে।

শিয়রে মৃত্যুর হাত। জরাজীর্ণ ফুসফুসে কখন
নিশ্বাস টানার দীর্ঘ যন্ত্রণার ক্লান্তি ধীরে ধীরে

স্তব্ধ হয়ে গেছে কেউ জানে না তা। ভোরের শিরশিরে
হাওয়ায় জানলার পর্দা কেঁপে উঠে তারপরে আবার
শান্ত হয়ে এল। ছায়া-অন্ধকার। মাঠ-নদী-বন
পেয়েছে নিদ্রার শান্তি। এদিকে রাত্রির অবসানে
সে-ও নেই। শান্তি! শান্তি! সে চলে গিয়েছে। সঙ্গে তার
কে গেছে জানে না কেউ, শুধু এই অন্ধকার জানে।

১৪ ভাদ্র, ১৩৫৮

ভয়

যদি এ চোখের জ্যোতি নিবে যায়, তবে
কী হবে, কী হবে!
দূর পথে ঘুরে ঘুরে ঢের নদীবন
খুঁজে যাকে এই রাতে নিয়ে এলে মন,
এখনো দেখিনি তাকে, দেখিনি, এখন
যদি এ চোখের জ্যোতি নিবে যায়, তবে
কী হবে, কী হবে!

সে-ও চলে যেতে পারে, যদি যায়, তবে
কী হবে, কী হবে!
এই যে চোখের আলো, ব্যথা-বেদনার
আগুনে রেখেছি তাকে জ্বেলে আমি, তার
দেখা পাওয়া যাবে, তাই। সে যদি আবার
চলে যায়, চোখভরা আলো নিয়ে তবে
কী হবে, কী হবে!

কখনো হারাই প্রাণ, কখনো প্রাণের
থেকেও যে প্রিয়তর, তাকে। সারাদিন
কথা মনে ছিল কোনো মায়াবী গানের,
সুর খুঁজে পেয়ে তার বিষাদমলিন
কথাগুলি যদি ফের ভুলে যাই, তবে
কী হবে, কী হবে!

২৯ কার্তিক, ১৩৫৮

মেঘডম্বরু

নেই তার রাত্রি, নেই দিন। প্রাণবীণার ঝংকারে
সুরের সহস্র পদ্ম ফুটে ওঠে অতল অশ্রুর
সরোবরে, যন্ত্রণার ঢেউয়ের আঘাতে। সেই সুর
খুঁজে ফিরি রাত্রিদিন। হৃদয়ের বৃন্তে নিরবধি
মুদ্রিতনয়ন পদ্মে যদি না সে শতলক্ষধারে
মন্ত্রবারি ঢালে, তার পাপড়িতে পাপড়িতে যদি না সে
জেগে থাকে নিষ্পলক তবে সে নিষ্ফল, না-ই যদি
ঝড়ের ঝংকার তোলে এই মেঘডম্বরু আকাশে।

আকাশ স্তম্ভিত। মন গম্ভীর। কখন গুরুগুরু
গানের উদ্দাম ঢেউ সমবেত কণ্ঠের আওয়াজে
ভেঙে পড়ে। পুঞ্জীভূত মেঘের মৃদঙ্গে পাখোয়াজে
বাজে তার সংগতের বিলম্বিত ধ্বনি। বারে বারে
জীবন লুণ্ঠিত যার, গানে তার উজ্জীবন শুরু;
প্রাণ তার পরিপূর্ণ মন্ত্রময় গানের ঝংকারে।

১৪ ফাল্গুন, ১৩৫৮

অমর্ত্য গান

সাধারণ, তুমি সাধারণ, তাই
অসাধারণের গানে
উতলা হয়ো না হয়ো না, তোমার
যা কিছু স্বপ্ন সীমা টানো তার,
তুলে দাও খিল হৃদয়ে, নিখিল
বসুধার সন্ধানে
যেয়ো না, তোমার নেই অধিকার
দুর্লভ তার গানে।

সাধারণ, তুমি সাধারণ, তাই
ছোট আশা ভালবাসা—
তা-ই দিয়ে ছোট হৃদয় ভরাও,
তার বেশী যদি কিছু পেতে চাও
পাবে না পাবে না, যাকে আজো চেনা
হল না, সর্বনাশা
সেই মায়াবীর গান ভুলে যাও,
ভোলো তার ভালবাসা।

সাধারণ, তুমি সাধারণ, তবু
অসাধারণের গানে
ভুলেছ ; পুড়েছে ছোট ছোট আশা
পুড়েছে তোমার ছোট ভালবাসা,
ছোট হাসি আর ছোট কান্নার
সব স্মৃতি সেই প্রাণে
বুঝি মুছে যায় যে-প্রাণ হারায়
সেই অমর্ত্য গানে।

১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

স্বপ্ন-কোরক

তবু সে হয়নি শান্ত। দীর্ঘ অমাবস্যার শিয়রে
যে-রাত্রে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে
মলিনলাবণ্য স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মমতা,
যে-রাত্রে সমস্ত তুচ্ছ অর্থহীন কথা
গানের মূর্ছনা হয়ে ওঠে,
শোক শান্ত হয়, দুঃখ নিভে আসে, যে-রাত্রে শীতার্ত মনে ফোটে
কল্পনার সুন্দর কুসুম, নামে সান্ত্বনার জল
চিন্তার আগুনে, আর আকন্যাকুমারীহিমাচল
কপালে জ্যোৎস্নার পঙ্ক মেখে
জেগে ওঠে অতলান্ত অন্ধকার সমুদ্রের থেকে,—
তখনো দেখলাম তাকে, কী এক অশান্ত আশা নিয়ে
সে খোঁজে রাত্রির পারাপার,
দুই চোখে তার
স্বপ্নের উজ্জ্বলশিখা প্রদীপ জ্বালিয়ে।

সে এক পরম শিল্পী। সংশয়-দ্বিধার অন্ধকারে
সে-ই বারে বারে
আলোকবর্তিকা জ্বালে, দুঃখ তার পায়ে মাথা কোটে,
তারই তো চুম্বনে ফুল ফোটে,
সে-ই তো প্রাণের বন্যা ঢালে
তুঙ্গভদ্রা, গঙ্গায় কি ভাক্‌রা-নাঙালে।
সে এক আশ্চর্য কবি, পাথরের গায়ে
সে-ই ব্রহ্মকমল ফোটায়।

কী যে নাম, মনে নেই তা তো—
আবদুল রহিম কিংবা শংকর মাহাতো,
অথবা অর্জুন সিং। মাঠে মাঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে
সে জাগে সমস্ত রাত স্বপ্নের কোরক হাতে নিয়ে।

আমার সমস্ত সুখ, সকল দুঃখের কাছাকাছি
সে আছে, আমিও তাই আছি।

৩ মাঘ, ১৩৬০

রৌদ্রের বাগান

কেন আর কান্নার ছায়ায়
অস্ফুট ব্যথার কানে কানে
কথা বলো, বেলা বয়ে যায়,
এসো এই রৌদ্রের বাগানে।

এসো অফুরন্ত হাওয়ায়,—
স্তবকিত সবুজ পাতার
কিশোর মুঠির ফাঁকে ফাঁকে
সারাটা সকাল গায়ে-গায়ে
যেখানে টগর জুঁই আর
সূর্যমুখীরা চেয়ে থাকে।

এসো, এই মাঠের উপরে
খানিক সময় বসে থাকি,
এসো, এই রৌদ্রের আগুনে
বিবর্ণ হলুদ হাত রাখি।
এই ধুধু আকাশের ঘরে
এমন নীরব ছলোছলো
করুণাশীতল হাসি শুনে
ঘরে কে ফিরতে চায় বলো।

এই আলো-হাওয়ার সকাল—
শোনো ওগো সুখবিলাসিনী,
কতদিন এখানে আসিনি ;
কত হাসি কত গান আশা
দূরে ঠেলে দিয়ে কতকাল
হয়নি তোমাকে ভালবাসা।

কেন আর কান্নার ছায়ায়
অস্ফুট ব্যথার কানে কানে
কথা বলো, বেলা বয়ে যায়,
এসো এই রৌদ্রের বাগানে।

২২ ফাল্গুন, ১৩৬০

আকাঙ্ক্ষা তাকে

আকাঙ্ক্ষা তাকে শান্তি দেয়নি,
শান্তির আশা দিয়ে বারবার
লুব্ধ করেছে। লোভ তাকে দূর
দুঃস্থ পাপের পথে টেনে নিয়ে
তবুও সুখের ক্ষুধা মেটায়নি,
দিনে দিনে আরো নতুন ক্ষুধাব
সৃষ্টি করেছে ; সুখলোভাতুর
আশায় দিয়েছে আগুন জ্বালিয়ে

এই যে আকাশ, আকাশের নীল,
এই যে সুস্থসবল হাওয়ার
আসা-যাওয়া, রূপরঙের মিছিল,
কোনোখানে নেই সান্ত্বনা তার।

বন্ধুরা তাকে যেটুকু দিয়েছে,
শত্রুরা তার সব কেড়ে নিয়ে
কোনো দূরদেশে ছেড়ে দিয়েছিল
কোনো দুর্গম পথে। তারপর
যখন সে প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে,
শোকের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে
প্রেম তাকে দিল সান্ত্বনা, দিল
স্বয়ংশান্তি তৃপ্তির ঘর।

৩ চৈত্র, ১৩৬০

অন্ত্য রঙ্গ

হা-রে রে রঙ্গীলা, তোর কথার টানে টানে
পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই ; সমস্ত রাতভোর
কোন্ কামনার আগুন ছুঁয়ে স্বপ্ন দেখি তোর,
কোন্ দুরাশার, রঙ্গীলা ? তুই হঠাৎ কোনোখানে
না ভাঙলে না-দেখার দেয়াল, মিথ্যে এ তোর খোঁজে
দিন কাটানো ; বাঁধন খোলার স্বপ্নে দিয়ে ছাই
ঘর ছাড়িয়ে পরিয়ে দিলি পথের বাঁধন, তাই
ব্যর্থ হলো রঙ্গীলা তোর সমস্ত রঙ্গ যে।

হা-রে রে রঙ্গীলা, তোর গানের টানে টানে
পার হয়েছি দুঃখ, তবু কেমন করে ভুলি
আজও আমার জীর্ণ শাখায় সুখের কুঁড়িগুলি
পাপড়ি মেলে দেয়নি, আমার শুকনো মরা গাঙে
তরঙ্গ নেই, হৃদয়ধনুর দৃপ্ত কঠিন ছিলা
দিনে দিনে শিথিল হল ; রঙ্গীলা, এইবার
অন্ধকারকে ছিন্ন করে ফুলের মন্ত্র আর
ঢেউয়ের মন্ত্র শেখা আমায়, রঙ্গীলা রঙ্গীলা।

হা-রে রে রঙ্গীলা, তোর সময় নিরবধি
রঙ্গও অনন্ত, আমার সময় নেই যে আর,
কে আমাকে শিখিয়ে দেবে পথের হাহাকার
কী করে হয় শান্ত, আমার প্রাণের শুকনো নদী
উজান বইবে কেমন করে, অমর্ত্য কোন্ গানে
ফুল ফুটিয়ে ব্যর্থ করি শীতের তাড়নায়,—
তুই যদি না শেখাস তবে চলব না আর, না,
রঙ্গীলা তোর কথার টানে, গানের টানে টানে।

২৬ বৈশাখ, ১৩৬১

দেয়াল

চেনা আলোর বিন্দুগুলি
হারিয়ে গেল হঠাৎ—
এখন আমি অন্ধকারে, একা।
যতই রাত্রি দীর্ণ করি দারুণ আর্তরবে,
এই নীরন্ধ্র নিকষ কালোর কঠিন অবয়বে
যতই করি আঘাত,
মিলবে না আর, মিলবে না আর,
মিলবে না তার দেখা।

হারিয়ে গেল হঠাৎ আমার
আলোকলতা-মন,—
নেই, এখানে নেই ;
হারিয়ে গেল প্রথম আলোর হঠাৎ-শিহরন,—
নেই।
চার-দেয়ালে বন্ধ হয়ে চার-দেয়ালের গায়ে
যতই হানি আঘাত, আমার আর্ত আকাঙ্ক্ষায়
যতই মুক্তিলাভের চেষ্টা করি,

ততই কঠিন পরিহাসের রাত্রি নামে, আর
ততই ভয়ের উজান ঠেলে মরি।

চেনা আলোর বিন্দুগুলি
হারিয়ে গেল হঠাৎ—
এখন আমি অন্ধকারে, একা।
চারদিকে চার দেয়াল, চোখের দৃষ্টি নিবে আসে,
শিউরে উঠি অন্ধকারের কঠিন পরিহাসে ;
এই নীরন্ধ্র অন্ধকারে যতই হানি আঘাত,
আসবে না আর, আসবে না কেউ,
মিলবে না তার দেখা।

ভাঙো আমার দেয়াল, আমার দেয়াল।

১৫ ভাদ্র, ১৩৬১

বারান্দা

'এ-কন্যা উচ্ছিষ্ট, কোনো লোলচর্ম বৃদ্ধ লালসার
দ্বাবিংশ সন্ধ্যার প্রণয়িনী।
ধিক্, এরে ধিক্!'
বলে সেই সত্যসন্ধ নিষ্পাপ প্রেমিক
বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।
সেখানে টগর জুঁই হাস্নুহানা রজনীগন্ধার
সহৃদয় সান্নিধ্যে এবং
সন্ধ্যার হাওয়ায় তাঁর ক্লিষ্ট স্নায়ুমন
শান্ত হয়ে এলে ফের অরিন্দম সেন
দু দণ্ড তন্ময় বসে থেকে
পুনরায় সেই একই চিন্তার হাঁটুতে মাথা রেখে
নবতর সিদ্ধান্তে এলেন :

'তা বলে কি প্রেম নেই ? প্রেমে শান্তি নেই ? আছে, আছে।
বিবৃতজঘনা এই কন্যাদের কাছে
সে-প্রেম যাবে না পাওয়া। কিংবা পাওয়া গেলেও বিস্তর
মূল্য দিতে হবে। আমি ততটা শাঁসালো
প্রেমিক যখন নই, অনিবার্য এই পরাজয়ে
শোকার্ত হব না। অতঃপর
আমার আশ্রয় নেওয়া ভাল
মেঘ-নদী-বৃক্ষলতাপাতার প্রণয়ে।'

অপিচ পরম রঙ্গে টবের গোলাপে
মগ্ন হয়ে দেখা যায়, সে এক আশ্চর্য প্রণয়িনী।
ঘনিষ্ঠ, তবুও শান্ত। এবং পাপড়িতে তার কাঁপে
সেই একই অপার্থিব অমর্ত্য পিপাসা,
যাকে বলি প্রেম।

তাই সমস্ত প্রগল্‌ভ ছিনিমিনি
শেষ হয়ে গেলে সেই প্রেমিক আবারো বুঝি পারে
হৃদয়ে জ্বালিয়ে নিতে আর-এক প্রসন্ন ভালবাসা
বারান্দার এই মৌন বসন্তবাহারে।

৩ ফাল্গুন, ১৩৬১

সহোদরা

না, সে নয়, অন্য কেউ এসেছিল ; ঘুমো, তুই ঘুমো।
এখনো রয়েছে রাত্রি, রোদ্দুরের চুমো
লাগেনি শিশিরে। ওরে বোকা,
আকাশে ফোটেনি আলো, দরজায় এখনো তার টোকা
পড়েনি। টগর বেল গন্ধরাজ জুঁই
সবাই ঘুমিয়ে আছে, তুই
জাগিসনে আর। তোর বরণডালার মালাগাছি
দে আমাকে, আমি জেগে আছি।

না রে মেয়ে, না রে বোকা মেয়ে,
আমি ঘুমোব না। আমি নির্জন পথের দিকে চেয়ে
এমন জেগেছি কত রাত।
এমন অনেক ব্যথা-আকাঙ্ক্ষার দাঁত
ছিঁড়েছে আমাকে। তুই ঘুমো দেখি, শান্ত হয়ে ঘুমো
শিশিরে লাগেনি তার চুমো,
বাতাসে ওঠেনি তার গান। ওরে বোকা,
এখনো রয়েছে রাত্রি, দরজায় পড়েনি তার টোকা।

১৪ চৈত্র, ১৩৬১

উপলচারণ

না, আমাকে তুমি শুধু আনন্দ দিয়ো না,
বরং দুঃখ দাও।
না, আমাকে সুখশয্যায় টেনে নিয়ো না,
পথের রুক্ষতাও
সইতে পারব, যদি আশা দাও দু হাতে।

ভেবেছিলে, এই দুঃখ আমার ভোলাবে।
আনন্দ দিয়ে ; হায়,
প্রেমে শত জ্বালা, সহস্র কাঁটা গোলাপে,
কে তাতে দুঃখ পায়,
যদি আশা জ্বলে মনের গোপন গুহাতে।

যে আমাকে চায় তন্দ্রার থেকে জাগাতে,
মোহ যে ভাঙাতে চায়
প্রবল পরুষ আশার বিপুল আঘাতে
কঠিন যন্ত্রণায়,
আমি তারই, তুমি দিয়ো না মমতা, গৃহ না

হয়ত বুঝিনি, হয়ত বোঝাতে পারিনি
তবু শুধু মনে হয়,
প্রেমের প্রকৃতি হয়ত উপলচারিণী,
যদিচ অসংশয়।
না, আমাকে তুমি করুণা দিয়ো না, দিয়ো না

১৫ ভাদ্র, ১৩৬২

হাতে ভীরু দীপ

হাতে ভীরু দীপ, পথে উন্মাদ হাওয়া,
ভ্রুকুটিকুটিল সহস্র ভয় মনে।
কেন ভয়? কেন এমন সঙ্গোপনে
পথে নেমে তোর বারে-বারে ফিরে চাওয়া?
এ কী ভয় তোর সকল সত্তা কাঁপায়?

আমি যে এসেছি, সে যেন জানতে না পায়।
দূরে হেলঙের পাহাড়, পাহাড়তলি
ছাড়িয়ে পিপলকোঠির চড়াই, আর
তারপরে সাঁকো। বাঁয়ে গেলে গঙ্গার
ধারে সেই গ্রাম, অমৌঠি রঙ্কোলি।

সেইখানে যাব। সামনের শীতে যদি
পাওয়া যায় জমি ঢালু সিয়াসাঙে, তাই
চলেছি। এ ছাড়া, জানেন গঙ্গামাঈ,
কোনো আশা নেই। বরফের তাড়া খেয়ে
নির্জন পাকদণ্ডির পথ বেয়ে
নীচে নেমে যাই। কী ভয়ে আমাকে কাঁপায়-
জানে মানাগাঁও, জানে পাহাড়িয়া নদী।
আমি যে এসেছি, সে যেন জানতে না পায়।

২৮ ভাদ্র, ১৩৬২

নিতান্ত কাঙাল

নিতান্তই ক্লান্ত লোকটা। শুধু
ছোট্ট একটা ঘরের কাঙাল।
দক্ষিণের জানলা দিয়ে ধুধু
অফুরন্ত মাঠ দেখবে। আর
পশ্চিমের জানলা দিয়ে লাল
সূর্য-ডোবা সন্ধ্যার বাহার।
নিতান্তই ক্লান্ত লোকটা। শুধু
ছোট্ট একটা ঘরের কাঙাল।

নিতান্তই শান্ত লোকটা। তাই
মিষ্টি একটা মেয়ের কাঙাল।
যে তাকে খুনসুটি করে প্রায়ই
রাত জাগাবে। বলবে, 'কোন্ দিশী
লোক তুমি তা বোঝা শক্ত। কাল
আনতে হবে আলতা এক শিশি!'
নিতান্তই শান্ত লোকটা। তাই
মিষ্টি একটা মেয়ের কাঙাল।

নিতান্তই ভ্রান্ত লোকটা। হায়,
অল্প-একটু সুখের কাঙাল।
রৌদ্রে, জলে, উদ্দাম হাওয়ায়
ঢের ঘুরেছে। বুঝল না এখনো
ইচ্ছার আগুনে খেয়ে জ্বাল
একটু-সুখে তৃপ্তি নেই কোনো!
নিতান্তই ভ্রান্ত লোকটা। হায়,
অল্প-একটু সুখের কাঙাল।

১২ আশ্বিন, ১৩৬২

হেলং

এ যেন আরণ্য প্রেত-রাত্রির শিয়রে এক মুঠো
জ্যোৎস্নার অভয়।
অন্তত তখন তা-ই মনে হয়েছিল
সুন্দরী হেলং, সেই পাহাড়িয়া বৃষ্টির তিমিরে।
সকাল থেকেই সূর্য নিখোঁজ। দক্ষিণে
স্পর্ধিত পাহাড়। বাঁয়ে অতল গড়খাই।
উন্মাদ হাওয়ার মাতামাতি
শীর্ণ গিরিপথে।
যেন কোনো রূপকথার হৃতমণি অন্ধ অজগর
প্রচণ্ড আক্রোশে তার গুহা থেকে আথালি-পাথালি
ছুটে আসে; শত্রু তার পলাতক জেনে
নিজেকে দংশন হানে, আর
মৃত্যুর পাখসাট খায় পাথরে পাথরে।

উপরে চক্রান্ত চলে ক্রূর দেবতার। ত্রস্ত পায়ে
নীচে নেমে আর-এক বিস্ময়।
এ কেমন অলৌকিক নিয়মে নিষ্ঠুর
ঝঞ্ঝা প্রতিহত, হাওয়া নিশ্চুপ এখানে।
নিত্যকার মতই দোকানী
সাজায় পসরা, চাষী মাঠে যায়, গৃহস্থ-বাড়ির
দেয়ালে চিত্রিত পট, শান্ত গাঁওবুড়া
গল্প বলে চায়ের মজলিসে।
দুঃখের নেপথ্যে স্থির, আনন্দের পরম আশ্রয়
প্রাণের গভীরে মগ্ন, ক্ষমায় সহাস্য গিরিদরি—
সুন্দরী হেলং।

অন্তত তখন তা-ই মনে হয়েছিল
তোমাকে, হেলং, সেই পাহাড়িয়া বৃষ্টির তিমিরে।

এবং এখনো মনে হয়,
তীব্রতম যন্ত্রণার গভীরে কোথাও
নিত্য প্রবাহিত হয় সেই আনন্দের স্রোতস্বিনী
যে জাগায় দারুণ ভয়ের
মর্মকোষে শান্ত বরাভয়।
মনে হয়, রক্তরঙ এই রঙ্গমঞ্চের আড়ালে
রয়েছে কোথাও
নেপথ্য-নাটকে স্থির নির্বিকার নায়ক-নায়িকা,
দাঁড়ে টিয়াপাখি, শান্তি টবের অর্কিডে।

২২ কার্তিক, ১৩৬২

যেহেতু

আশা ছিল শান্তিতে থাকার,
আহা, ব্যর্থ হল সেই আশা,
যেহেতু মস্তিষ্কে ছিল তার
মস্ত একটা ভিমরুলের বাসা।

এবং সাদা যে কালো নয়,
কালো নয় নীল কিংবা লাল,
যেহেতু সে তাতেও সংশয়
লালন করেছে চিরকাল।

বন্ধুদের পরামর্শ শুনে
মীমাংসার বারিবিন্দুগুলি
অবিলম্বে চিন্তার আগুনে
ছিটোতে পারলেই তার খুলি
ঠাণ্ডা হয়ে আসত। সে যেহেতু
সাধ্য আর সাধনায় সেতু

বেঁধে নিতে চায়নি, বারবার
পরাস্ত হয়েও প্রাণপণে
নৌকা খুলে দিয়েছিল তার
অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পিছনে···

এবং যেহেতু তার মনে
ইথে কোনো সন্দেহ ছিল না,
যা-কিছু ঝলসায় ক্ষণে-ক্ষণে
সমস্তই নয় তার সোনা,
সুতরাং শান্তিতে থাকার,
আহা, ব্যর্থ হল সব আশা,
মস্তিষ্কে অবশ্য ছিল তার
মস্ত একটা ভিমরুলের বাসা।

৪ বৈশাখ, ১৩৬৩

মৃত্যুর পরে

দু দণ্ড দাঁড়াই ঘাটে। এই স্থির শান্ত জলে তার
আয়ত দৃষ্টির মৌন রহস্য বিম্বিত হয় যদি।
দু দণ্ড দাঁড়াই এই আদি অন্ধকারে। বলি, 'নদী,
কে তার ব্যর্থতাগুলি ক্ষিপ্র হাতে নিয়েছে কুড়িয়ে
সন্ধ্যার আকাশ, অস্ত-সূর্য আর নিঃসঙ্গ হাওয়ার
বিষণ্ণ মর্মর থেকে, শীতের সন্ন্যাসী-বনভূমি
থেকে? তুমি নাকি? তার আকাঙ্ক্ষার ক্লান্ত পথ দিয়ে
কে ফিরে এসেছে এই অপরূপ অন্ধকারে,— তুমি?'

দু দণ্ড দাঁড়াই ঘাটে। তরঙ্গের অস্ফুট কল্লোলে
কান পাতি। যদি তার কণ্ঠের আভাস পাওয়া যায়।

যদি এই মধ্যরাত্রে শীত-শীত সুন্দর হাওয়ায়
নদীর গভীরে তার কান্না জেগে ওঠে। হাত রাখি
জলের শরীরে। বলি, 'নদী, তোর নয়নের কোলে
এত অন্ধকার কেন, তুই তার অশ্রুজল নাকি ?'

১৭ আষাঢ়, ১৩৬৩

হঠাৎ হাওয়া

হঠাৎ হাওয়া উঠেছে এই দুপুরে,
আকাশী নীল শান্তি বুঝি ছিনিয়ে নিতে চায়।
মালোঠিগাঁও বিমূঢ়, হতবাক্ !
মেঘের ক্রোধ গর্জে ওঠে ঝড়ের ডঙ্কায়।
এখনই এল ডাক ?
মন্দাকিনী মিলায় তাল তরঙ্গের নূপুরে।

এ যেন হরধনুর টান ছিলাতে
হেনেছে কেউ প্রবল টংকার।
দিনের চোখ মীলিত। কার ভীষণ জটাজাল
আকাশে পড়ে ছড়িয়ে, শোনো বাতাসে বাজে তার
সঘন করতাল।
ত্রিলোক কোটিকণ্ঠে চায় গানের গলা মিলাতে।

এ যেন কোন্ শিল্পী তার খেয়ালে
উপুড় করে দিয়েছে কালো রঙ
আকাশময়। পাখিরা ত্রাসে কুলায়ে ফিরে যায়।
কে যেন তার ক্রোধের কশা দারুণ নির্মম
হানে হাওয়ার গায়ে।
অট্টহাসি ধ্বনিত তার গিরিগুহার দেয়ালে।

এবং, ভ্যাখো, নিমেষে যেন কী করে
মিলিয়ে যায় খামার-ঘরবাড়ি,
মিলিয়ে যায় নিকট-দূর পর্বতের চূড়া।
খেতের কাজ গুছিয়ে মাঠচটিতে দেয় পাড়ি
ত্রস্ত গাঁ'ওবুড়া।
বিদ্যুতের নাগিনী ধায় মেঘের কালো শিখরে

হঠাৎ হাওয়া উঠেছে এই দুপুরে,
আকাশী নীল শান্তি যেন ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
মালোঠিগাঁ'ও বিমূঢ়, হতবাক্!
মেঘের ক্রোধ গর্জে ওঠে ঝড়ের ডঙ্কায়।
এসেছে তার ডাক।
মন্দাকিনী মিলায় তাল তরঙ্গের নূপুরে।

২৩ ভাদ্র, ১৩৬৩

প্রিয়তমাসু

তুমি বলেছিলে, ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই।
অথচ ক্ষমাই আছে।
প্রসন্ন হাতে কে ঢালে জীবন শীতের শীর্ণ গাছে;
অন্তরে তার কোনো ক্ষোভ জমা নেই!

তুমি বলেছিলে, তমিস্রা জয়ী হবে।
তমিস্রা জয়ী হল না।
দিনের দেবতা ছিন্ন করেছে অমারাত্রির ছলনা;
ভরেছে হৃদয় শিশিরের সৌরভে।

তুমি বলেছিলে, বিচ্ছেদই শেষ কথা।
শেষ কথা কেউ জানে?

কথা যে ছড়িয়ে আছে হৃদয়ের সব গানে, সবখানে ;
তারও পরে আছে বাঙ্ময় নীরবতা।

এবং তুষারমৌলি পাহাড়ে কুয়াশা গিয়েছে টুটে,
এবং নীলাভ রৌদ্রকিরণে ঝরে প্রশান্ত ক্ষমা,
এবং পৃথিবী রৌদ্রকে ধরে প্রসন্ন করপুটে।
ছাখো, কোনোখানে কোনো বিচ্ছেদ নেই ;
আছে অনন্ত মিলনে অমেয় আনন্দ, প্রিয়তমা।

২৮ ভাদ্র, ১৩৬৩

মাটির হাতে

এ কোন্ যন্ত্রণা দিবসে, আর
এ কোন্ যন্ত্রণা রাতে ;
আকাশী স্বপ্ন সে ছুঁয়েছে তার
মাটিতে গড়া দুই হাতে।

বোঝেনি, রাত্রির ঝড়ো হাওয়ায়
যখন চলে মাতামাতি,
জ্বলতে নেই কোনো আকাঙ্ক্ষায়
জ্বালাতে নেই মোমবাতি।

ভেবেছে, সবখানে খোলা দুয়ার,
ছাখেনি দেয়ালের লেখা ;
এবং বোঝেনি যে, বারান্দার
ধারেই তার সীমারেখা।

তবু সে গিয়েছিল বারান্দায়,
কাঁপেনি তবু তার বুক ;

তবু সে মোমবাতি জ্বেলেছে, হায়,
দেখেছে আকাশের মুখ।

এখন যন্ত্রণা দিবসে, আর
এখন যন্ত্রণা রাতে।
আকাশী স্বপ্ন সে ছুঁয়েছে তার
মাটিতে গড়া দুই হাতে।

৬ আশ্বিন, ১৩৬৩

সান্ধ্য তামাশা

হা-রে হা-রে হা-রে, ছাখো, হা-রে
কী জমাট সান্ধ্য তামাশায়
আকাশের পশ্চিম দুয়ারে
সূর্য তার ডুগডুগি বাজায়।

টকটকে আগুনে জ্বেলে দিয়ে
আকাশের শান্ত রাজধানী
শূন্যে ও কে দিয়েছে উড়িয়ে
রক্তরং সতরঞ্জখানি।

ছাখো রে পুঞ্জিত মেঘে মেঘে
চিত্রিত অলিন্দে ঝরোকায়
রঙের সংহত ছোঁয়া লেগে
সারি বেঁধে ও কারা দাঁড়ায়।

হা-রে হা-রে হা-রে, ছাখো, হা-রে
কী জমাট সান্ধ্য তামাশায়···

ও কারা কৌতুকে ঠোঁট চেপে
সায়াহ্নের সংবৃত আবেগে

দ্যাখে ভেল্কিবাজের চাতুরি ;
কী করে সে শূন্যে জাল বেয়ে
নিখিল সন্ধ্যায় করে চুরি
নানাবর্ণ মাছের সম্ভার।
দর্শকেরা রয়েছে তাকিয়ে,
তবু কিছু লজ্জা নেই তার।

অন্তিম তামাশা ছিল বাকি।
অকস্মাৎ চক্ষের নিমেষে
নিঃসঙ্গ বিহ্বল এক পাখি
বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে এসে
যেন মায়ামন্ত্রবলে প্রায়
ডুবেছে অথই লাল জলে।
গেল, গেল ! — মেঘেরা দৌড়ায়
নিঃশব্দ ভীষণ কোলাহলে।

হা-রে হা-রে হা-রে, দ্যাখো, হা-রে,
কী জমাট সান্ধ্য তামাশায়
আকাশের পশ্চিম দুয়ারে
সূর্য তার ডুগডুগি বাজায়।

১০ শ্রাবণ, ১৩৬৪

নিজের বাড়ি

ভাবতে ভাল লেগেছিল, এই ঘর, ওই শান্ত উঠোন,
এই খেত, ওই মস্ত খামার—
সবই আমার।
এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি

ইচ্ছেমতন জানলা-দরজা খুলতে,
ইচ্ছেমতন সাজিয়ে তুলতে
শান্ত সুখী একান্ত এই বাড়ি।

ভাবতে ভাল লেগেছিল, চেয়ার, টেবিল,
আলমারিতে সাজানো বই, ঘোমটা-টানা নরম আলো,
ফুলদানে ফুল, রঙের বাটি,
আলনা জুড়ে কাপড়-জামার
সুবিন্যস্ত সমারোহ, সবই আমার।
এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি
দেয়ালে লাল হলুদ রঙের কাড়াকাড়ি
মুছে ফেলতে সাদার শান্ত টানে।
এই যে বাড়ি, এই ত আমার বাড়ি।

ভাবতে ভাল লেগেছিল, এই ঘর, ওই ঠাণ্ডা উঠোন,
এই খেত, ওই মস্ত খামার,
আলমারিতে সাজানো বই,
ফুলদানে ফুল, রঙের বাটি,
টবের গোলাপ, নরম আলো,
আলনা জুড়ে কাপড়-জামার
শৃঙ্খলিত সমারোহ, সবই আমার, সব-ই আমার।

ভাবতে ভাল লেগেছিল, কাউকে কিছু না জানিয়ে
হঠাৎ কোথাও চলে যাব।
ফিরে এসে আবার যেন দেখতে পারি,
যে-নদী বয় অন্ধকারে, তারই বুকের কাছে
বাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
ওই যে বাড়ি, ওই ত আমার বাড়ি।

১৭ শ্রাবণ, ১৩৬৪

অল্প-একটু আকাশ

অতঃপর সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।
জুঁইয়ের গন্ধে বাতাস যেখানে মন্থর হয়ে আছে;
এবং, রেলিংয়ে ভর দিয়ে
যেখান থেকে অল্প-একটু আকাশ দেখা যায়।

আকাশ!
এতক্ষণে তার মনে পড়ল,
সারাটা সকাল, সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা
কাজের পাথরে মাথা ঠুকতে ঠুকতে, মাথা ঠুকতে ঠুকতে
মাথা ঠোকাই তার সার হয়েছে।
কোনো-কিছুই সে শুনতে পায়নি;
না একটা গান, না একটু হাসি।
এখন শুনবে।
কোনো-কিছুই সে দেখতে পায়নি;
না একটা ফুল, না একটু আকাশ।
এখন দেখবে।

রুগ্‌ণ স্ত্রীকে মেজার-গ্লাসে-মাপা ওষুধ খাইয়ে,
কুঁচকে-যাওয়া বালিশটাকে গুছিয়ে রেখে,
ঘুমন্ত ছেলের ইজেরের দড়িটাকে আর-একটু আলগা করে দিয়ে,
সে তাই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

১৮ ভাদ্র, ১৩৬৪

জলের কল্লোলে

জলের কল্লোলে যেন কারও কান্না শোনা গেল,
অরণ্যের মর্মরে কারও দীর্ঘনিশ্বাস।
চকিত হয়ে ফিরে চাইতেই দেখা গেল
নির্বান্ধব সেই বাবলা গাছটাকে।
আজ আর তাকে গাছ বলে মনে হল না :
মনে হল,
সংসারের সমস্ত রহস্য জেনে নিয়ে
কেউ যেন জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফলত, যা হয়,
অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল সেই মানুষটি।
কেননা, জীবনের কাছে মার খেয়ে
প্রকৃতির কাছে সে তার দুঃখ জানাতে এসেছিল।
প্রকৃতির নিজেরই যে এত দুঃখ,
সে তা জানত না।
জলের কল্লোলে যে কারও কান্না ধ্বনিত হতে পারে,
অরণ্যের মর্মরে কারও নিশ্বাস,
সে তা বোঝেনি।
এবং ভাবেনি যে, নদীর ধারের সেই বাবলা গাছটাকে আজ
বিষণ্ণ একটা মানুষের মত দেখাবে।

নদীকে সে তার দুঃখ জানাতে এসেছিল।
জানাল না।
সন্ধ্যার আগেই সে তার ঘরে ফিরে এল।

২৪ ভাদ্র, ১৩৬৩

মাঠের সন্ধ্যা

অন্যমনে যেতে যেতে হঠাৎ যদি
মাঠের মধ্যে দাঁড়াই,
হঠাৎ যদি তাকাই পিছন দিকে,
হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে বিকেলবেলার নদীটিকে।

ও নদী, ও রহস্যময় নদী,
অন্ধকারে হারিয়ে যাসনে, একটু দাঁড়া ;
এই যে একটু-একটু আলো, এই যে ছায়া ফিকে-ফিকে,
এরই মধ্যে দেখে নেব সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারাটিকে।

ও তারা, ও রহস্যময় তারা,
একটু আলো জ্বালিয়ে ধর, দেখে রাখি
আকাশী কোন্ বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যায় দিকে-দিকে,
দেখে রাখি অন্ধকারে উড়ন্ত ওই ক্লান্ত পাখিটিকে।

ও পাখি, ও রহস্যময় পাখি।
হারিয়ে গেল আকাশ-মাটি, কান্না-পাওয়া
এ কী করুণ সন্ধ্যা ! এ কোন্ হাওয়া লেগে
অন্ধকারে অদৃশ্য ওই নদীর দুঃখ হঠাৎ উঠল জেগে।
ও হাওয়া, ও রহস্যময় হাওয়া !

২ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

চলন্ত ট্রেনের থেকে

চলন্ত ট্রেনের থেকে শুধু মাঠ, ঘরবাড়ি এবং
গাছপালা, পুকুর, পাখি, করবীর ফুলন্ত শাখায়
প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখে যতটুকু তৃপ্তি পাওয়া যায়,
সেইটুকুই পাওয়া। তার অতিরিক্ত কে দেবে তোমাকে

দুই চক্ষু ভরে তবে ছাখো ওই সূর্যাস্তের রঙ
পশ্চিম আকাশে ; ছাখো পুঞ্জিত মেঘের গাঢ় লাল
রক্ত-সমারোহ ; ছাখো, উন্মত্ত উল্লাসে ঝাঁকে-ঝাঁকে
সবুজ ভুট্টার খেতে উড্ডীন অসংখ্য হরিয়াল।

চলন্ত ট্রেনের থেকে ধুধু মাঠ, ঘরবাড়ি অথবা
ঘরোয়া স্টেশনে আঁকা চিত্রপটে করবীর ঝাড়,
গাছপালা, পুকুর, পাখি, গৃহস্থের সচ্ছল সংসার,
কর্মের আনন্দ, দুঃখ দেখে নাও ; আকাশের গায়ে
লগ্ন হয়ে আছে ছাখো প্রাণের প্রকাণ্ড লাল জবা।

সমস্ত পৃথিবী এসে দাঁড়িয়েছে ট্রেনের জানলায়।

১৩৬৪

শিল্পীর ভূমিকা

আপনি ত জানেন, শুধু আপনিই জানেন, কী আনন্দে
এখনও মূর্খের শূন্য অট্টহাসি, নিন্দুকের ক্ষিপ্র
জিহ্বাকে সে তুচ্ছ করে নিতান্তই অনায়াসে ; তীব্র
দুঃখের মুহূর্তে আজও কী পরম প্রত্যয়ের শান্তি
শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখে ; সন্ধ্যামালতীর মৃদু গন্ধে
কেন তার রাত্রি আজও স্বপ্নের গভীরে হয় শান্ত ;
কেন তার স্বপ্ন হয় সমুদ্রের মত নীলকান্তি ;
উপরে যন্ত্রণা যার, অন্তরালে সুধা অতলান্ত।

আপনি ত জানেন, শুধু আপনিই জানেন, মায়ামঞ্চে
কেউ বা সম্রাট হয়, কেউ মন্ত্রী, কেউ মহামাত্য ;

শিল্পীর ভূমিকা তার, সাময়িক সমস্ত দৌরাত্ম্য
দেখার ভূমিকা। তাতে দুঃখ নেই। কেননা, অনন্ত
কালের মৃদঙ্গ ওই বাজে তার মনের মালঞ্চে।
ত্রিকালী আনন্দ তার; নেই তার আদি, নেই অন্ত।

২৬ মাঘ, ১৩৬৪

তোমাকে বলেছিলাম

তোমাকে বলেছিলাম, যত দেরিই হক,
আবার আমি ফিরে আসব।
ফিরে আসব তল-আঁধারি অশথগাছটাকে বাঁয়ে রেখে,
ঝালোডাঙার বিল পেরিয়ে,
হলুদ-ফুলের মাঠের উপর দিয়ে
আবার আমি ফিরে আসব।
আমি তোমাকে বলেছিলাম।

আমি তোমাকে বলেছিলাম, এই যাওয়াটা কিছু নয়,
আবার আমি ফিরে আসব।
ডগডগে লালের নেশায় আকাশটাকে মাতিয়ে দিয়ে
সূর্য যখন ডুবে যাবে,
নৌকার গলুইয়ে মাথা রেখে
নদীর ছল্‌ছল্‌ জলের শব্দ শুনতে শুনতে
আবার আমি ফিরে আসব।
আমি তোমাকে বলেছিলাম।

আজও আমার ফেরা হয়নি।
রক্তের সেই আবেগ এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে।
তবু যেন আবছা আবছা মনে পড়ে,
আমি তোমাকে বলেছিলাম।

২৫ চৈত্র, ১৩৬৪

অমলকান্তি

অমলকান্তি আমার বন্ধু,
ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।
রোজ দেরি করে ক্লাসে আসত, পড়া পারত না,
শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে
এমন অবাক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকত যে,
দেখে ভারী কষ্ট হত আমাদের।

আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি।
সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল!
ক্ষান্তবর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,
জাম আর জামরুলের পাতায়
যা নাকি অল্প-একটু হাসির মতন লেগে থাকে।

আমরা কেউ মাস্টার হয়েছি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে।
মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ;
চা খায়, এটা-ওটা গল্প করে, তারপর বলে, "উঠি তা হলে।"
আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমাদের মধ্যে যে এখন মাস্টারি করে,
অনায়াসে সে ডাক্তার হতে পারত ;
যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল,
উকিল হলে তার এমন কিছু ক্ষতি হত না।

অথচ, সকলেরই ইচ্ছেপূরণ হল, এক অমলকান্তি ছাড়া
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সেই অমলকান্তি— রোদ্দুরের কথা ভাবতে ভাবতে
যে একদিন রোদ্দুর হয়ে যেতে চেয়েছিল।

১৮ জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৫

আবহমান

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে,
কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে।
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে,
এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালবাসে।
ফুরয় না, তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

ফুরয় না তার যাওয়া এবং ফুরয় না তার আসা,
ফুরয় না সেই একগুঁয়েটার দুরন্ত পিপাসা।
সারাটা দিন আপন মনে ঘাসের গন্ধ মাখে,
সারাটা রাত তারায় তারায় স্বপ্ন এঁকে রাখে।
ফুরয় না, তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

নেভে না তার যন্ত্রণা যে, দুঃখ হয় না বাসী,
হারায় না তার বাগান থেকে কুন্দফুলের হাসি।
তেমনি করেই সূর্য ওঠে, তেমনি করেই ছায়া
নামলে আবার ছুটে আসে সান্ধ্য নদীর হাওয়া।
ফুরয় না, তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
এখনো সেই ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

১৮ ভাদ্র, ১৩৬৫

আংটিটা

আংটিটা ফিরিয়ে দিও, ভানুমতী, সমস্ত সকাল
দুপুর বিকেল তুমি হাতে পেয়েছিলে।
যদি মনে হয়ে থাকে, আকাশের বৃষ্টিধোয়া নীলে
দুঃখের শুশ্রূষা নেই, যদি
উন্মত্ত হাওয়ার মাঠে কিংশুকের লাল
পাপড়িও না পেরে থাকে রুগ্‌ণ বুকে সাহস জাগাতে,
অথবা সান্ত্বনা দিতে বৈকালের নদী,—
আংটিটা ফিরিয়ে দিও সন্ধ্যার সহিষ্ণু শান্ত হাতে।

আংটিটা ফিরিয়ে দিও। এ-আংটি যেহেতু তারই হাতে
মানায়, যে পায় খুঁজে পত্রালীর ভিড়ে

ফুলের সুন্দর মুখ, ঘনকৃষ্ণ মেঘের শরীরে
রৌদ্রের আলপনা। কোনো ক্ষতি
ফেরাতে পারে না তাকে তীব্রতম দুঃখের আঘাতে

আংটিটা ফিরিয়ে দিও, তাতে দুঃখ নেই, ভানুমতী।

২৩ ভাদ্র, ১৩৬৫

ফলতায় রবিবার

কেউ কি শহরে যাবে ? কেউ যাবে ? কেউই যাব না।
বরং ঘনিষ্ঠ এই সন্ধ্যার সুন্দর হাওয়া খাব,
বরং লুণ্ঠিত এই ঘাসে ঘাসে আকণ্ঠ বেড়াব
আমি, অমিতাভ আর সিতাংশু।

সিতাংশু, এই ভালো,
শহরে ফিরব না। দ্যাখো, অমিতাভ, কতখানি সোনা
ডুবে গেল নদীর শরীরে। দ্যাখো, তরঙ্গের গায়ে
নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ে, আলো কাঁপে, আলো
ভেঙে ভেঙে যায়।

কেউ কি শহরে যাবে ? কেউ যাবে ? কেউই যাব না।
শহরে প্রচণ্ড ভিড়, অকারণ তুমুল চিৎকার,
নগ্ন নিয়নের বাতি। শহরে ফিরব না কেউ আর।
বরং চুপ করে দেখি, অন্ধকারে নদী কত কালো
হতে পারে, অপচয়ী সূর্য তার সবটুকু সোনা
কী করে ওড়ায় ; দেখি মৃদুকণ্ঠ তরঙ্গমালায়
নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ে, আলো কাঁপে, আলো
ভেঙে ভেঙে যায়।

২৫ মাঘ, ১৩৬৫

সোনালী বৃত্তে

একটুখানি কাছে এসেই দূরে যায়,
নোয়ানো এই ডালের 'পরে
একটু বসেই উড়ে যায়।
ওই তো আমার বিকেলবেলার পাখি।

সোনালী এই আলোর বৃত্তে
থেমে থাকি,
অশথ গাছের কচি পাতায় হাওয়ার নৃত্যে
দৃষ্টি রাখি।
একটু থামি, একটু দাঁড়াই,
একটু ঘুরে আসি আবার।
কখন যে সেই দূরে যাবার
সময় হবে, জানি না তা।
রৌদ্রে ওড়ে পাখি, কাঁপে অশথ গাছের কচি পাতা

দুপুরবেলার দৃশ্য নদী হারিয়ে যায় বারে বারে
সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে।
তবু আবার
সময় আসে নদীর স্বপ্নে ফিরে যাবার।
নদীও যে পাখির মতোই, কাছের থেকে দূরে যায়,
মনের কাছে বাঁক নিয়ে সে ঘুরে যায়।

একটুখানি এগিয়ে তাই আলোর বৃত্তে
থেমে থাকি,
অশথ গাছের কচি পাতায় হাওয়ার নৃত্যে
দৃষ্টি রাখি।

১৩৬৫

জুনের দুপুর

উপর থেকে নীচে তাকাও, ছাখো,
ছায়াছবির মতোই হঠাৎ
চোখের সামনে থেকে
এরোড্রমটা দৌড়ে পালায়
পৃথিবী যায় বেঁকে।
রইল পড়ে দশটা-পাঁচটা,
ঝাঁকড়া-মাথা মেপ্‌ল গাছটা,
চওড়া-ফিতে রাস্তাটা আর
নদীর নীলচে শাড়ি,
ফুলের বাগান, গির্জে, খামার.
ছক-কাটা ঘরবাড়ি।

উপর থেকে নীচে তাকাও, ছাখো,
লক্ষ লক্ষ টুকরো দৃশ্য
নতুন করে ভেঁজে
একটি অসীম রিক্ততাকে
তৈরি করল কে যে।
নোত্‌রদামের গির্জেটা আর
হোটেল, কাফে, মস্ত টাওয়ার
মিলিয়ে দিচ্ছে মেঘের শান্ত
হাল্কা নীলের তুলি।
মিলায় মিলায় পারির প্রান্ত-
রেখার দৃশ্যগুলি।

উপর থেকে নীচে তাকাও, ছাখো
দৃশ্যহারা দীর্ঘ দুপুর
সমস্ত দিক ধুধু,
জুনের আকাশ আপন মনে
রৌদ্র পোহায় শুধু।

কোথায় ফাটছে আগুন বোমা,
কোথায় কাইরো, কোথায় রোমা !
শূন্য মোছায় দেখার ভ্রান্তি
নিত্যদিনের চোখে।
বিশ্ববিহীনতার শান্তি অসীম ঊর্ধ্বলোকে।

৮ ভাদ্র, ১৩৬৬

হলুদ আলোর কবিতা

দুয়ারে হলুদ পর্দা। পর্দার বাহিরে ধুধু মাঠ।
আকাশে গৈরিক আলো জ্বলে।
পৃথিবী কাঞ্চনপ্রভ রৌদ্রের অনলে
শুদ্ধ হয়।
কারা যেন সংসারের মায়াবী কপাট
খুলে দিয়ে ঘাস, লতা, পাখির স্বভাবে
সানন্দ সুস্থির চিত্তে মিশে গেছে। শান্ত দশ দিক।
দুয়ারে হলুদ পর্দা। আকাশে গৈরিক
আলো কাঁপে। সারাদিন কাঁপে।

আকাশে গৈরিক আলো। হেমন্ত-দিনের মৃদু হাওয়া
কৌতুকে আঙুল রাখে ঘরের কপাটে,
জানালায়। পশ্চিমের মাঠে
মানুষের স্নিগ্ধ কণ্ঠ। কে জানে মানুষ আজও মেঘ
হতে গিয়ে স্বর্ণাভ মেঘের স্থির ছায়া
হয়ে যায় কিনা। তার সমস্ত আবেগ
হয়ত সংহত হয় রোদ্দুরের হলুদ উত্তাপে।

আলো কাঁপে। সারাদিন কাঁপে।

৩ পৌষ, ১৩৬৬

বৃদ্ধের স্বভাবে

“এককালে আমিও খুব মাংস খেতে পারতুম, জানো হে ;
দাঁত ছিল, মাংসে তাই আনন্দ পেতুম।
তোমার ঠানদিদি রোজ কব্জি-ডোবা বাটিতে, জানো হে,
না না, শুধু মাংস নয়, মাংস মাছ ইত্যাদি আমায়
(রান্নাঘর নিরামিষ, তাই রান্নাঘরের দাওয়ায়)
সাজিয়ে দিতেন। আমি চেটেপুটে নিত্যই খেতুম।
সে-সব দিনকাল ছিল আলাদা, জানো হে,
হজমের শক্তি ছিল, রাত্তিরে সুন্দর হত ঘুম।”

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, রোগা ঢ্যাঙা বৃদ্ধ এক তার
পাতের উপরে দিব্য জমিয়েছে মাংসের পাহাড়।
যদিও খাচ্ছে না। শুধু মাংসল স্মৃতির তীব্র মোহে
ক্রমাগত বলে যাচ্ছে— ‘জানো হে, জানো হে’ !

২১ আষাঢ়, ১৩৬৭

দৃশ্যের বাহিরে

সিতাংশু, আমাকে তুই যত-কিছু বলতে চাস, বল।
যত কথা বলতে চাস, বল।
অথবা একটাও কথা বলিস নে, তুই
বলতে দে আমাকে তোর কথা।
সিতাংশু, আমি যে তোর সমস্ত কথাই জেনে গেছি।
আমি জেনে গেছি।

কী বলবি আমাকে তুই, সিতাংশু ? বলবি যে,
ঘরের ভিতরে তোর শান্তি নেই, তোর
শান্তি নেই, তোর
ঘরের ভিতরে বড় অন্ধকার, বড়

অন্ধকার, বড়
বেশী অন্ধকার তোর ঘরের ভিতরে।
(সিতাংশু, আমি যে তোর সমস্ত কথাই জেনে গেছি।
আমি জেনে গেছি।)

কী বলবি আমাকে তুই, সিতাংশু ? বলবি যে,
দৃশ্যের সংসার থেকে তুই
(সংসারের যাবতীয় অস্থির দৃশ্যের থেকে তুই)
স্থিরতর কোনো-এক দৃশ্যে যেতে গিয়ে,
যে-দৃশ্য অনন্ত ভাল, সেই স্থির দৃশ্যে যেতে গিয়ে
গিয়েছিস স্থির এক দৃশ্যহীনতায়।
অনন্ত রাত্রির ঠাণ্ডা নিদারুণ দৃশ্যহীনতায়।
দৃশ্যের বাহিরে তোর ঘরে।

জানি রে, সিতাংশু, তোর ঘরের চরিত্র আমি জানি।
ওখানে অনেক কষ্টে শোয়া চলে, কোনোক্রমে দাঁড়ানো চলে না।
ও-ঘরে জানালা নেই, আর
ও-ঘরে জানালা নেই, আর
মাথার ছ ইঞ্চি মাত্র ঊর্ধ্বে ছাত। মেঝে
স্যাঁতসেতে। দরোজা নেই। একটাও দরোজা নেই। তোর
চারিদিকে কাঠের দেয়াল।
চারিদিকে নির্বিকার কাঠের দেয়াল।
এবং দেয়ালে নেই ঈশ্বরের ছবি।

এবং দেয়ালে নেই শয়তানের ছবি।
(তা যদি থাকত, তবে ঈশ্বরের ছবির অভাব
ভুলে যাওয়া যেত) নেই, তা-ও নেই তোর
নির্বিকার ঘরের ভিতরে।

না, আমি যাব না তোর ঘরের ভিতরে।
যাব না, সিতাংশু, আমি কিছুতে যাব না।
যেখানে ঈশ্বর নেই, যেখানে শয়তান নেই, কোনো-কিছু নেই,

প্রেম নেই, ঘৃণা নেই, সেখানে যাব না।
যাব না, যেহেতু আমি মূর্তিহীন ঈশ্বরের থেকে
দৃশ্যমান শয়তানের মুখশ্রী এখনও ভালবাসি।
না, আমি যাব না তোর ঘরের ভিতরে।

সিতাংশু, তুই-ই বা কেন গেলি ?
অস্থির দৃশ্যের থেকে কেন গেলি তুই
স্থির নির্বিকার ওই দৃশ্যহীনতায় ?

সিতাংশু, আমি যে তোর সমস্ত কথাই জেনে গেছি
আমি জেনে গেছি।
দৃশ্যের ভিতর থেকে দৃশ্যের বাহিরে
প্রেম-ঘৃণা-রক্ত থেকে প্রেম-ঘৃণা-রক্তের বাহিরে
গিয়ে তোর শান্তি নেই, তোর
শান্তি নেই, তোর
ঘরের ভিতরে বড় অন্ধকার, বড
অন্ধকার, বড়
বেশী অন্ধকার তোর ঘরের ভিতরে।

২৪ শ্রাবণ, ১৩৬৭

মৌলিক নিষাদ

পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি; রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে

যেখানে তাকাই— শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে আছি।

এই এক আশ্চর্য সময়।
যখন আশ্চর্য বলে কোনো-কিছু নেই।
যখন নদীতে জল আছে কি না-আছে
কেউ তা জানে না।
যখন পাহাড়ে মেঘ আছে কি না-আছে
কেউ তা জানে না।
পিতামহ, আমি এক আশ্চর্য সময়ে বেঁচে আছি।
যখন আকাশে আলো নেই,
যখন মাটিতে আলো নেই,
যখন সন্দেহ জাগে, আলোকিত ইচ্ছার উপরে
রেখেছে নিষ্ঠুর হাত পৃথিবীর মৌলিক নিষাদ— এই ভয়

পিতামহ, তোমার আকাশ
নীল— কতখানি নীল ছিল?
আমার আকাশ নীল নয়।
পিতামহ, তোমার হৃদয়
নীল— কতখানি নীল ছিল?
আমার হৃদয় নীল নয়।
আকাশের, হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা
আপাতত কোনো-এক স্থির অন্ধকারে শুয়ে আছে।

পিতামহ, আমি সেই দারুণ নিবিড় অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
মনে হয়, আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে

যেখানে তাকাই— শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
অন্ধকারে জেগে আছে মৌলিক নিষাদ— এই ভয়।

৩ ভাদ্র, ১৩৬৭

মিলিত মৃত্যু

বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মহননের পথ
পরিষ্কার করে।

প্রসঙ্গত, শুভেন্দুর কথা বলা যাক।
শুভেন্দু এবং সুধা কায়মনোবাক্যে এক হতে গিয়েছিল।
তারা বেঁচে নেই।
অথবা মৃন্ময় পাকড়াশী।
মৃন্ময় এবং মায়া নিজেদের মধ্যে কোনো বিভেদ রাখেনি
তারা বেঁচে নেই।
চিন্তায় একান্নবর্তী হতে গিয়ে কেউই বাঁচে না।

যে যার আপন রঙ্গে বেঁচে থাকা ভাল, এই জেনে—
মিলিত মৃত্যুর থেকে বেঁচে থাকা ভাল, এই জেনে—
তা হলে দ্বিমত হও। আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
তা হলে বিক্ষত হও তর্কের পাথরে।
তা হলে শানিত করো বুদ্ধির নখর।
প্রতিবাদ করো।

ওই ছাখো কয়েকটি অবিবাদী স্থির
অভিন্নকল্পনাবুদ্ধি যুবক-যুবতী হেঁটে যায়।
পরস্পরের সব ইচ্ছায় সহজে ওরা দিয়েছে সম্মতি।
ওরা আর তাকাবে না ফিরে।
ওরা একমত হবে, ওরা একমত হবে, ওরা
একমত হতে-হতে কুতুবের সিঁড়ি
বেয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যাবে, লাফ দেবে শূন্যের শরীরে

২৪ ফাল্গুন, ১৩৬৭

বাঘ

আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে ফেঁড়ে কাণ্ডটাকে ফুলন্ত গাছের
তখনও দাউ-দাউ জ্বলে রাগ।
চিত্রিত বিরাট বাঘ
ফিরে যায় ঘাসের জঙ্গলে। থেকে-থেকে
শরীরে চমকায় জ্বালা। দূরের কাছের
ছবিগুলি স্থির পাংশু ; ত্রিজগৎ নিশ্বাস হারায়
চলন্ত হলুদ-কালো চিত্রখানি দেখে।
বাঘ যায়। বনের আতঙ্ক হেঁটে যায়।

বাঘ যায়। অন্ধকার বনের নিয়তি।
চিত্রিত আগুনখানি যেন ধীরে ধীরে
হেঁটে যায়। প্রকাণ্ড শরীরে
চমকায় হলুদ জ্বালা। বড় জ্বালা। শোণিতে শিরায়
যেন ঝড়-বিদ্যুতের গতি
সংবৃত রাখার জ্বালা বুঝে নিতে-নিতে
বাঘ যায়। অরণ্যের আদিম নিয়তি হেঁটে যায়।
আমরা নিশ্চিন্ত বসে বাঘ দেখি ডিস্‌নির ছবিতে।

১৩ চৈত্র, ১৩৬৭

নীরক্ত করবী

আমরা দেখি না, কিন্তু অসংখ্য মানুষ একদিন
পূর্বাকাশে সেই শুদ্ধ উদ্ভাস দেখেছে,
যাকে দেখে মনে হত, নিহত সিংহের পিঠে গর্বিত পা রেখে
স্বর্গের শিকারী দাঁড়িয়েছে।
আমরা এখন সেই উদ্ভাস দেখি না।

এখন রোদ্দুর দেখে মনে হয়, রোদ্দুরের পেটে
অনেক আঁধার রয়ে গেল।
যেহেতু উদরে অন্ন, রক্তে বমনের ইচ্ছা নিয়ে
তবুও সহাস্য হাঁটে সুবেশ যুবক,
যেহেতু শয়তান তার শখ
মটাবার জন্যে পারে ঈশ্বরের মুখোশ ভাঙাতে,
অতএব অন্ধকার রাতে
মায়াবী রোদ্দুর দেখা অসম্ভব নয়।

রৌদ্রের বাগানে রক্তকরবীনিচয়
ফুটেছে, ফুটুক।
আমি রক্তকরবীর লজ্জাহীন প্রণয়ে যাব না।
এখন যাব না।
রৌদ্র যে মুখোশ নয়, ঈশ্বরের মুখ,
আগে তা সুস্থির জেনে নেব।
না-জেনে এখনই আমি বাহির-দুয়ারে দাঁড়াব না।

স্বর্গের পুতুল

কে কতটা নত হব, যেন সব স্থির করা আছে।
যেন প্রত্যেকেই তার উদ্বৃত্ত ভূমিকা অনুযায়ী
উজ্জ্বল আলোর নীচে নত হয়।
সম্রাট, সৈনিক, বেশ্যা, জাদুকর, শিল্পী ও কেরানী,
কবি, অধ্যাপক, কিংবা মাংসের দোকানে
যাকে নির্বিকার মুখে মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়াতে দেখেছি
এবং গর্দানে-রাংয়ে যে তখন মগ্ন হয়ে ছিল,
তারা প্রত্যেকেই আসে উজ্জ্বল আলোর নীচে একবার।
কপালে স্বেদের বিন্দু, সানন্দ সুঠাম ঘুরে গিয়ে
তারা প্রত্যেকেই নত হয়।

কেউ বেশী, কেউ কম, কিন্তু প্রত্যেকেই নত হবে
উজ্জ্বল আলোর নীচে একবার।
না-কেনা না-বেচা পণ্য, স্বর্গের তটিনী
সারাদিন জ্বলে ;
এবং সৈনিক, বেশ্যা, কলাবিৎ, ভাড়াটিয়া গুণ্ডা, কারিগর
একবার সেখানে যায়, যে যার ভূমিকা অনুযায়ী
নত হয় ; স্বর্গ থেকে প্রলম্বিত আলোর সলিলে
মুখ প্রক্ষালন করে নেয়।

ঘরের বাহিরে জ্বলে দৈব জলধারা ;
ছাখো আলো জ্বলে, ছাখো আলোর তরঙ্গ জ্বলে, আলো—
সকালে দুপুরে সারাদিন।
স্বর্গের তটিনী জ্বলে, আলো জ্বলে, আলো,
যেখানে দাঁড়াও।
কে বড়বাজারে যাবে, দু গজ মার্কিন এনে দিয়ো ;
কে যাও পারস্যে, এনো সুন্দর গালিচা ;

কে যাও তটিনীতীরে স্বর্গের পুতুল,
কিছুই এনো না, তুমি যাও।

সূর্যাস্তের পর

সূর্য ডুবে যাবার পর
হাসির দমকে তাদের মুখের চামড়া কুঁচকে গেল,
গালের মাংস কাঁপতে লাগল,
বাঁ চোখ বুঁজে, ডান হাতের আঙুল মটকে
তারা বলল,
"শত্রুরা নিপাত যাক।"

আমি দেখলাম, দিগন্ত থেকে গুঁড়ি মেরে
ঠিক একটা শিকারী জন্তুর মতন
রাত্রি এগিয়ে আসছে।
বললাম, "রাত্রি হল।"
তারা বলল, "হোক।"
বললাম, "রাত্রিকে যেন একটা জন্তুর মতন দেখাচ্ছে।"
তারা বলল, "রাত্রি তো জন্তুই।
আমরা এখন উলঙ্গ হয়ে
ওই জন্তুর পূজায় বসব।
তুমি ফুল আনতে যাও।"

আমি ফুল আনতে যাচ্ছিলাম।
পিছন থেকে তারা আমাকে ডাকল।
বলল, "ফুলগুলিকে ঘাড় মুচড়ে নিয়ে আসবে।"

নরকবাসের পর

১. তোমরা পুরানো বন্ধু। তোমরা আগের মত আছ।
আগের মতই স্থির শান্ত স্বাভাবিক।
দেখে ভাল লাগে।
প্রাচীন প্রথার প্রতি আনুগত্যবশত তোমরা
এখনও প্রত্যহ দেখা দাও,
কুশল জিজ্ঞাসা করো আজও।
দেখে ভাল লাগে।
তোমরা এখনও সুস্থ অনুগত আলোকিত আছ।

তোমরা পুরানো বন্ধু। অমিতাভ স্নেহাংশু অমল।
তোমরা এখনও
সুস্থির দাঁড়িয়ে আছ আপন জমিতে।
সাঁইত্রিশ বছর তোমরা আপন জমিতে
দাঁড়িয়ে রয়েছ সুস্থ মাননীয় বৃক্ষের মতন।
দেখে ভাল লাগে।
আমি নিজে সুস্থ নই, সূর্যালোকে সুন্দর অথবা।

২. আমি নিজে সুস্থ নই, আলোকিত সুন্দর অথবা।
আমি এক সুদূর বিদেশে,
অতি দূর অনাত্মীয় আঁধার বিদেশে
বৃথাই ঘুরেছি
দীর্ঘ দশ বছর, অমল।

অমল, তুমি ত রৌদ্র হতে চেয়েছিলে;
স্নেহাংশু, তোমার লক্ষ্য আকাশের অব্যয় নীলিমা;
তুমি অমিতাভ, তুমি জলের তরঙ্গ ভালবাসো।
আমি দীর্ঘ এক যুগ রোদ্দুরের ভিতরে যাইনি।
আকাশ দেখিনি।

সমুদ্র দেখিনি।
কী করে আকাশ তার মুখ দেখে সমুদ্রে— দেখিনি।
আমি এক আঁধার বিদেশে
চোখের সমস্ত আলো, বুকের সাহস,
দেহের সমস্ত স্বাস্থ্য তিলে-তিলে বিসর্জন দিয়ে,
দিনকে রাত্রির থেকে পৃথক না-জেনে
দিন কাটিয়েছি।

৩. আঁধার বিদেশ থেকে কখনও ফেরে না কেউ। আমি
আবার ফিরেছি।
ফ্যাকাশে চামড়া, চোখে মৃত ইলিশের দৃষ্টি নিয়ে
ফিরেছি আবার আমি— অমিতাভ, স্নেহাংশু, অমল।
এবং দেখছি তোমাদের।

তোমরা পুরানো বন্ধু। তোমরা আগের মত আছ।
দেখে ভাল লাগে।
তোমরা এখনও সুস্থ অনুগত আলোকিত আছ।
দেখে ভাল লাগে।
আমিও আবার স্থির সুস্থ স্বাভাবিক হতে চাই।

তাই আমি ফিরেছি আবার
অমিতাভ, স্নেহাংশু, অমল।
তাই তোমাদের কাছে আবার এসেছি।
তিনটি জীবন্ত চেনা মানুষের কাছে
এসে দাঁড়িয়েছি।
উপরে আকাশ, নীচে অনন্ত সুন্দর জলরাশি,
পিছনে পাহাড়,
শোণিতে দৃশ্যের আলো জ্বলে।
আমি এইখানে এই বান-ডাকা রৌদ্রের বিভায়
অবিকল মাননীয় বৃক্ষের মতন
দু দণ্ড দাঁড়াব।

স্বাস্থ্য ফিরাবার জন্য এখন খানিক পথ্য প্রয়োজন হবে।
আমি এইখানে এই সমুদ্রবেলায়
অফুরন্ত নীলিমার নীচে
প্রত্যহ এখন যদি একগ্লাস টাট্‌কা রোদ খেয়ে যেতে পারি,
তবে আমি সুস্থ হয়ে যাব।

তোমাকে নয়

যেন কাউকে কটুবাক্য বলবার ভীষণ
প্রয়োজন ছিল।
কিন্তু না, তোমাকে নয় ; কিন্তু না, তোমাকে নয়।
যেন যত দুঃখ আমি পেয়েছি, এবারে
চতুর্গুণ করে তাকে ফিরিয়ে দেবার
প্রয়োজন ছিল।
কিন্তু না, তোমাকে নয় ; কিন্তু না, তোমাকে নয়।

দুই চক্ষু ভেসে গেল রক্তের ধারায়।
দমিত আক্রোশে খুঁড়ি নিজের পাতাল।
দ্যাখো আমি যন্ত্রণার দাউ-দাউ আগুনে
জ্বলে যাচ্ছি, নেমে যাচ্ছি হিংসার নরকে।
যেন আত্মনিগ্রহের নরকে না-গিয়ে
সমস্ত যন্ত্রণা আজ ফিরিয়ে দেবার
প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু না, তোমাকে নয় ; কিন্তু না, তোমাকে নয়…

ভিতর-বাড়িতে রাত্রি

রাত্রি হলে একা-একা পৃথিবীর ভিতর-বাড়িতে
যেতে হয়।
সারাদিন দলবদ্ধ, এখানে-ওখানে ঘুরি ফিরি,
বাজারে বাণিজ্যে যাই ;
মাঝে-মাঝে রোমাঞ্চিত হবার তাগিদে
সামান্য ঝুঁকিতে বসি তাসের আড্ডায় ;
কেউ বা তিন-আনা জেতে, কেউ হারে।
রাত করলে সবাই উঠে যায়।
মাথায় কান-ঢাকা টুপি, পায়ে মোজা, বারোটা-রাত্তিরে
জানি না কোথায় যায় তুরি তিরি রাজা ও রমণী।
আমি যাব ভিতর-বাড়িতে।

ভিতর-বাড়ির রাস্তা এখনও রহস্যময় যেন।
এত যে বয়স হল, তবুও অচেনা লাগে।
কোথায় কবাট-জানলা, উঠোন, মন্দির, কুয়োতলা,
কুলুঙ্গি, ঘোরানো সিঁড়ি, বারান্দা, জলের কুঁজো।
কোথায় ময়নাটা ঠায় রাত্রি জাগে।
বুঝবার উপায় নেই কিছুই, অন্তত আমি কিছুই বুঝি না।
বাড়িটা ঘুমের মধ্যে হানাবাড়ি। তবু
দুয়ার ঠেললেই কেউ ভীষণ চেঁচিয়ে উঠবে, এমন আশঙ্কা হয়।
দুয়ার ঠেলি না, আমি সারা রাত্রি দেখি
খরস্রোত অন্ধকার বয়ে যায় ভিতর-বাড়িতে।

বৃষ্টিতে নিজের মুখ

অরণ্য, আকাশ, পাখি, অন্তহীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—
আকাশ, সমুদ্র, মাটি, অন্তহীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—
সমুদ্র, অরণ্য, পাখি, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
যতই ঘোরাও, আমি কী নতুন দেখব জাদুকর ?

যেন দূরদেশে কোন্ প্রভাতবেলায়
যেতে গিয়ে আবার ফিরেছি
আজন্ম নদীর ধারে, পরিচিত বৃষ্টির ভিতর।
যেন সব চেনা লাগে। ফুল, পাতা, কিউমুলাস মেঘের জানালা,
সটান সহজ বৃক্ষ, গ্রামের সুন্দরী, আর
নানাবিধ গম্বুজ মিনার।
যেন যত দৃশ্য দেখি আয়নার ভিতরে,
উদ্ভিদ, মানুষ, মেঘ, বিকেলবেলার নদী—
বৃষ্টির ভিতরে সব দেখা হয়, সব
নিজের মুখের মতো পরিচিত। আমি
এই পরিচিত দৃশ্য কতবার দেখব জাদুকর ?

আয়নায় জলের স্রোত, অন্তহীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—
উদ্ভিদ, মানুষ, মেঘ, অন্তহীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—
হাতের আমলকীমালা, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
যতই ঘোরাও, আমি কী নতুন দেখব জাদুকর ?

বৃষ্টির ভিতরে সব দেখি যেন, আমি
আজন্ম নদীর ধারে, প্রাচীন ছায়ায়
পাহাড়, গম্বুজ, মেঘ, গ্রামের বালিকা,
দেবালয়, নদীজলে বশংবদ দৃশ্যের গাগরি
দেখে যাই, যেন সব বৃষ্টির ভিতরে দেখে যাই।
যখন প্রত্যেকে আজ দ্বিতীয় স্বদেশে
চলেছে, তখনও দেখি আয়নার ভিতরে জলধারা

নেমেছে রক্তের মতো। যাবতীয় পুরানো দৃশ্যের
ললাটে রক্তের ধারা বহে যায়। আমি
পুরানো আয়নার কাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
নিজের রক্তাক্ত মুখ কত আর দেখব জাদুকর?

জলে নামবার আগে

সকলে মিলিত হয়ে যেতে চাই আজ
পৃথিবীর মিশকালো ঘরে।
গিয়ে স্থির হতে চাই, কাঠের জাহাজ
যেমন সুস্থির হয় জলের জঠরে।
কেননা আলোয় যারা করে চলাচল,
ডাঙাই তাদের কাছে বিশ বাঁও জল।

যেন সব ভুলে যাই, কোন্‌খান থেকে
কত দূরে কোথায় এলাম।
আলোকিত দেবতার মুখ যায় বেঁকে,
প্রেমিক জানে না তার প্রেমিকার নাম।
জীবনে কোথাও ছিল এত বড দহ,
জানত না মানুষের বাপ-পিতামহ।

অথচ আকাশ নীল। ফুলের প্রণয়
হাওয়ায় সলিলে ওই ভাসে।
ছোঁবার সাহস নেই, যেন খুব ভয়
শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসে।
যদিও সবাই জানে, খুঁজতে গেলেই
দেখা যাবে, কারও আজ শিরদাঁড়া নেই

ফলত সবাই যেন যেতে চাই আজ
পৃথিবীর মিশকালো ঘরে।
সবাই লুকোতে চাই ; কাঁকড়া কি মাছ
যেমন লুকিয়ে থাকে জলের জঠরে।
এদিকে ডাঙায় যারা করে চলাচল.
ডাঙাই তাদের কাছে বিশ বাঁও জল।

যবনিকা কম্পমান

কেহই কিংখাবে আর ঢাকে না বিরহ :
দাঁত নখ ইত্যাদি সবাই আজ
অনায়াসে দেখতে দেয়। পৃথিবীর নিখিল সন্ধ্যায়
গোপন থাকে না কিছু। যত কিছু
দেখিনি, এবারে সব দেখা হয়।

যেন পশুলোমে সব ঢাকা ছিল। গোলাপী কম্বল
তুলে নিলে স্পষ্ট হয় কিছু রক্ত, আর
পিত্তের সবুজ, পুঁজ, কফ, লালা,
গয়ের ইত্যাদি। সব গোলাপী কম্বলে চাপা দিয়ে
প্রত্যেকে দেখিয়েছিল এতকাল
গাঞী, গোত্র, মেল।
অর্থাৎ মার্জিত পরিভাষার সুন্দর যবনিকা।

যবনিকা কম্পমান। দেখে যান বার্ট্রাণ্ড রাসেল।

অন্ধের সমাজে একা

রাস্তার দুইধারে আজ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছে অন্ধ সেনাদল ;
আমি চক্ষুষ্মান হেঁটে যাই
প্রধান সড়কে। দেখি, বল্লমের ধাতু
রোদ্দুরের প্রেম পায়, বন্দুকের কুঁদার উপরে
কেটে বসে কঠিন আঙুল।
যে-কোনো মুহূর্তে ঘোর মারামারি হতে পারে, তবু
অস্ত্রগুলি উল্টানো রয়েছে আপাতত।
পরস্পরের দিকে পিঠ দিয়ে সকলে এখন
সম্মান রচনা করে। আমি দেখি,
অযুত নিযুত অন্ধ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছে রাস্তার উপরে
আমি চক্ষুষ্মান হেঁটে যাই।

আমি সেনাপতি। আমি সৈন্য-পরিদর্শনে এসেছি।
কিন্তু কার সেনাপতি, কাহাকে সমরে নেব, কিছুই জানি না।
আমি শুধু দেখতে পাই, দশ লক্ষ যোদ্ধার সভায়
কাহারো কপালে অক্ষিতারকার শোভা নেই ;
কপালে গভীর দুই গর্ত নিয়ে সবাই দাম্ভিক দাঁড়িয়েছে।
আমি একা দেখতে পাই, আমি একা দেখতে পাই, আমি
দশ লক্ষ যুযুধান অন্ধের সভায় আজ একা।
অথচ অন্ধের দেশে একা চক্ষুষ্মান হওয়া খুব ভয়াবহ।
প্রধান সড়কে তাই সৈন্য-পরিদর্শনের কালে
বারবার চমকে উঠি। মনে হয়,
অন্ধের সমাজে একা চক্ষুষ্মান হবার অধিক
বিড়ম্বনা কিছু নেই, কখনো ছিল না।

রাস্তার দুই ধারে আজ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছে যুদ্ধে সমুৎসুক
অন্ধ সেনাদল।
আমি হেঁটে যাই। আমি হেঁটে যেতে যেতে

গুরুবন্দনার ছলে দেখে যাই, বল্লমের ধাতু
রোদ্দুরে হতেছে সেঁকা, বন্দুকের কুঁদার উপরে
কেটে বসে কঠিন আঙুল।
আপাতত রণাঙ্গন নিস্তব্ধ যদিও,
আমি তবু বুঝতে পারি, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের আগুনে
সর্বত্র ভীষণ ধুমধাড়াক্কার উদ্যোগ চলেছে।

আমি সেনাপতি। আমি প্রধান সড়কে হেঁটে যাই।
অথচ কখন যুদ্ধ শুরু হবে, কার যুদ্ধ, কিছুই জানি না।
কাহাকে সমরে নেব, কিছুই জানি না।
(আমি কার সেনাপতি, আমি কার সেনাপতি) আমি
অন্ধের সমাজে একা চক্ষুষ্মান হবার বিপদ
টের পেতে পেতে আজ গুরুবন্দনার ছলে ভাবি,
এবার পালানো ভাল দৌড়িয়ে! নতুবা
যদি ভীমরবে সেই বিস্ফোরণ ঘটে যায়, তবে—
যেহেতু নিদানকালে চক্ষুলজ্জা ভয়াবহ, তাই—
নিজের চক্ষুকে হয়ত নিজের নখরাঘাতে উপড়ে ফেলে দিয়ে
অন্ধের সমাজে আজ মিশে যেতে হবে।

জিম করবেটের চব্বিশ ঘণ্টা

সারাটা দিন ছায়া পড়ে।
যত দূরে যেখানে যাই,
পাহাড় ভাঙি, তাঁবু ওঠাই—
ছায়া পড়ে।

দৃশ্য অনেক, নেবার পাত্র
পৃথিবীতে একটা মাত্র—
ছায়া পড়ে।
সারা সকাল, সারা দুপুর,
সারা বিকেল, সারাটা রাত
মনের মধ্যে হলুদ-কালো চতুর একটা ছায়া পড়ে।

সারাটা দিন ছায়া পড়ে।
এই যে বসি, এই যে উঠি,
থেকে-থেকে বাইরে ছুটি—
ছায়া পড়ে।
পিছন-পিছন ঘুরেছি যার,
সেই নিয়েছে পিছু আমার—
ছায়া পড়ে।
সারা সকাল, সারা দুপুর,
সারা বিকেল, সারাটা রাত
মনের মধ্যে হলুদ-কালো চতুর একটা ছায়া পড়ে।

সারাটা দিন ছায়া পড়ে।
সকল কাজে, সকল কথায়,
জলেস্থলে তরুলতায়—
ছায়া পড়ে।
এখন আমি বুঝব কিসে
শিকার কিংবা শিকারী সে—
ছায়া পড়ে।
সারা সকাল, সারা দুপুর,
সারা বিকেল, সারাটা রাত
মনের মধ্যে হলুদ-কালো চতুর একটা ছায়া পড়ে।

বার্মিংহামের বুড়ো

"ফুলেও সুগন্ধ নেই। অন্তত আমার
যৌবনবয়সে ছিল যতখানি, আজ তার অর্ধেক পাই না।
এখন আকাশ পাংশু, পায়ের তলার ঘাস
অর্ধেক সবুজ, নদী নীল নয়। তা ছাড়া দেখুন
স্ট্রবেরি বিস্বাদ, মাংস রবারের মত শক্ত। ভীষণ সেয়ানা
গরুগুলি। বালতি ভরে দুধ
দেয় বটে, কিন্তু খুব জোলো দুধ। নির্বোধ পশুও
দুগ্ধের ঘনতা আজ চুরি করে কী অবলীলায়।
এদিকে মদ্যও প্রায় জলবৎ। আগে
দু-তিনটে বিয়ার টেনে অক্লেশে মাতাল হওয়া যেত।
ইদানীং কম করেও পাঁচ বোতল লাগে।"

বার্মিংহামের সেই বুড়োটার লাগে। যে সেদিন
ফুল নদী ঘাস মেঘ আকাশ স্ট্রবেরি
মাংস দুধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ভীষণ
অভিযোগ তুলেছিল। যার
বিধ্বস্ত মুখের ভাঁজে তিলমাত্র করুণা ছিল না,
উদরে সক্রিয় ছিল পাঁচ বোতল ঘোলাটে বিয়ার।

মাটির মুরতি

তার মূর্তিখানি আজ গলে যায় রক্তের ভিতরে।
কাদায় বানানো মূর্তি ; ললাট, নাসিকা,
চোয়াল, ওষ্ঠের ডৌল, নাভিমূল
ধীরে গলে যায়। চক্ষু গলে যায়। সব নির্মাণের

জোড় একে-একে আজ খুলে আসে। দম্ভের, ক্ষমার,
চতুর ফন্দির, শান্ত করুণার, হিংসার, প্রেমের
সমস্ত কড়ি ও বর্গা খসে পড়ে। যতনে যোজিত
উপাদানগুলি আজ পাতালগঙ্গায়
ভেসে যেতে থাকে। তার কাদার শরীর
মেদ মাংস ধীরে-ধীরে রক্তের ভিতরে গলে যায়।

স্মৃতির ভিতরে কেউ পা ঝুলিয়ে কখনও বোসো না।
স্মৃতি বড় ভয়াবহ। স্মরণের গভীর পাতালে
লেগেই রয়েছে দাঙ্গা, খুন, রাহাজানি। নিশিদিন
স্মরণের গভীর পাতালে
রক্তের ভীষণ ঢেউ বহে যায়। পাহাড়প্রমাণ ঢেউ
স্মৃতির পাতাল থেকে উঠে আসে।
উঠে এসেছিল আজ। চোখের সমুখ থেকে
আর-একটি মূর্তিকে তারা লুফে নিয়ে গেল।
কাদায় বানানো মূর্তি, তার মূর্তিখানি আজ পাতালগঙ্গায়
ভেসে চলে। ললাট, নাসিকা,
চোয়াল, কণ্ঠার হাড়, নাভিমূল, যতনে যোজিত
মাটির পেরেক-বল্ট রক্তের ভিতরে গলে যায়।

তর্জনী

তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো…কখনো বলবে না…
কাকে…তুমি ভয় দেখাও কাকে…
আমি অনায়াসে সব ভেঙে ফেলতে পারি…
মুহূর্তে তছনছ করে দিতে পারি সবকিছু…

বাঁ পায়ের নির্দয় আঘাতে আমি সব
মুছে ফেলতে পারি···
তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো···কখনো বলবে না···

ভীষণ চমকিয়ে দিয়ে দশটার এক্সপ্রেস চলে গেল।
পরক্ষণে পৃথিবী নীরব।
তারের উপরে বাজে হাওয়ার শাণিত ভাষা, আর ।
মিলায় চাকার শব্দ···তর্জনী দেখিয়ে কেন···
তর্জনী দেখিয়ে কেন
যেন-বা হুড়মুড় শব্দে স্বপ্নের বাড়িটা
ভেঙে পড়তে গিয়ে টাল সামলে নিয়ে এখন আবার
অতল নয়নজলে জেগে রয় ॥

প্রেমিকের ভূমি

চুলের ফিতায় ঝুল-কাঁটাতারে আরও একবার
শেষবার ঝাঁপ দিতে আজ
বড় সাধ হয়। আজ দুর্বল হাঁটুতে
আরও একবার, শেষবার,
নবীন প্রতিজ্ঞা, জোর অনুভব করে নিয়ে ধ্বংসের পাহাড়
বেয়ে টান উঠে যেতে ইচ্ছা হয়
মেঘলোকে। মনে হয়,
স্মৃতির পাতাল কিংবা অভ্রভেদী পাহাড়ের চূড়া
ব্যতীত কোথাও তার ভূমি নেই।

প্রেমিকের নেই। তাই অতল পাতালে
অথবা পাহাড়ে তার দৃষ্টি ধায়।

মনে হয়, অন্ধকারে কোটি জোনাকির শবদেহ
মাড়িয়ে আবার ঝুল-কাঁটাতারে চুলের ফিতায়
ভীষণ লাফিয়ে পড়ি। অথবা হাঁটুতে
নবীন রক্তের জোর অনুভব করে নিয়ে যুগল পাহাড়
ভেঙে উঠে যাই মেঘলোকে।
আরও একবার যাই, আরও একবার, শেষবার।

পুতুলের সন্ধ্যা

আবার সহজে তারা ফিরে আসে আষাঢ়-সন্ধ্যায়।
তারা ফিরে আসে। কাগজের
সানন্দ তরণী, সাদা মাটির বিড়াল—
মুখে মস্ত ইলিশের পেটি ; ফিরে আসে
কাঠের জিরাফ, সিংহ, কাকাতুয়া, আহ্লাদী পুতুল ;
উড়ন্ত কিন্নরী ; খড়কুটা ও কাপড়ে
ফাঁপানো ভীষণ মোটা শাশুড়ী, তরুণী বধূ, ফুল, লতাপাতা ;
কুরুশ-কাঁটার পদ্ম। একদা ফিরতেই হবে
জেনে সকলেই তারা আষাঢ়-সন্ধ্যায়
সহজ খুশিতে ফেরে 'মনে রেখো'-ছবির শৈশবে।

সবাই সহজে ফেরে। সময়ের কাঁটা
ঘুরিয়ে আবার যেন শৈশব-দিবসে ফেরা বড়ই সহজ।
কাঠের আলমারি কিংবা কলি-না-ফেরানো
দেয়ালের শূন্য জমি আষাঢ়-দিবসে
আবার সহজে তাই ভরে ওঠে, অপ্সরা-কিন্নরী-
জিরাফ-শাশুড়ী-বউ-সিংহ-কাকাতুয়ার বিভায়।

যেন অনায়াসে কোনো প্রাচীন জনতা
সমস্ত আইন ফাঁকি দিয়ে
সন্ধ্যার চৌরঙ্গি রোড একে-একে নির্বিকার পার হয়ে যায়—
সহজ আনন্দে, হাতে হ্যারিকেন-লণ্ঠন ঝুলিয়ে।

মল্লিকার মৃতদেহ

উদ্যানে গিয়েছি আমি বারবার! দেখেছি, উদ্যান
বড় শান্ত ভূমি নয়। উদ্যানের গভীর ভিতরে
ফুলে ফুলে
তরুতে তরুতে
লতায় পাতায়
ভীষণ চক্রান্ত চলে; চক্ষের নিমেষে খুন রক্তপাত
নিঃশব্দে সমাধা হয়। উদ্যানের গভীর ভিতরে
যত না সৌন্দর্য, তার দশ গুণ বিভীষিকা।

উদ্যানে গিয়েছি আমি বারবার। সেখানে কখনও
কেহ যেন শান্তির সন্ধানে আর নাহি যায়।
যাওয়া অর্থহীন; তার কারণ সেখানে
কিছু ফুল
নিতান্ত নিরীহ বটে, কিন্তু বাদবাকী
ফুলেরা হিংস্থক বড়, আত্মরূপরটনায় তারা
যেমন উৎসাহী তত বলবান, হত্যাপরায়ণ।
উদ্যানে গিয়েছি আমি বারবার। সেখানে রূপের
অহঙ্কার ক্ষমাহীন। সেখানে রঙের
দাঙ্গায় নিহত হয় শত-শত দুর্বল কুসুম।

আজ প্রত্যুষেই আমি উদ্যানের বিখ্যাত ভিতরে
মল্লিকার মৃতদেহ দেখতে পেয়েছি।
চক্ষু বিস্ফারিত, দেহ ছিন্নভিন্ন, বুক
তখনও কি উষ্ণ ছিল মল্লিকার ?
কার নখরের চিহ্ন মল্লিকার বুকে ছিল,
কে হত্যা করেছে তাকে, কিছুই জানি না।
কিন্তু গোলাপের লতা অতখানি এগিয়ে তখন
পথের উপরে কেন ঝুঁকে ছিল ?
এবং রঙ্গন কেন আমাকে দেখেই
অত্যন্ত নীরবে
হঠাৎ ফিরিয়ে নিল মুখ ?

আমার বাগানে আরও কতগুলি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে ?

উপাসনার সায়াহ্ন

ভীষণ প্রাসাদ জ্বলে, যেন চিরকাল জ্বলে সায়াহ্নবেলায়।
অলিন্দ, ঝরোকা, শ্বেতমর্মরের সমস্ত নির্মাণ
জ্বলে ওঠে। আগুনের সুন্দর খেলায়
দাউদাউ জ্বলে হর্ম্য, প্রমোদ-নিকুঞ্জ। কিংবা সাধের তরণী
অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন অন্যপথে ধীরে আগুয়ান
হতে গিয়ে অগ্নিবলয়ের দিকে ঘুরে যায়।
মুহূর্তে মাস্তুলে, পালে, পাটাতনে প্রচণ্ড হলুদ
জ্বলে ওঠে।
সাধের তরণী জ্বলে, যেন চিরকাল জ্বলে সায়াহ্নবেলায়।

জানি না কখনও কেউ এমন জ্বলেছে কিনা সায়াহ্নবেলায়।
যেমন প্রাসাদ জ্বলে, অলিন্দ, ঝরোকা কিংবা শ্বেতমর্মরের
বিবিধ নির্মাণ। যথা সহসা দাউদাউ
প্রমোদ-নিকুঞ্জ, ঝাউ-বীথিকা, হ্রদের জল, জলের উপরে
সাধের তরণীখানি জ্বলে ওঠে।
যেমন কুটির কিংবা অট্টালিকা কিছুকাল চিত্রের মতন স্থির থেকে তারপর
অগ্নিবলয়ের দিকে চলে যায়।
যেমন পর্বত পশু সহসা সুন্দর হয় বাহিরে ও ঘরে।
যেমন সমস্ত-কিছু জ্বলে, চিরকাল জ্বলে সায়াহ্নবেলায়।

বয়ঃসন্ধি

কে কোন্ ভূমিকা নেব, কে কার বান্ধব হব, এইবাবে সব
জানা যাবে বেতার-বার্তায়।
পুরানো বন্ধু ও পুঁথি, ইজের-কামিজ-ধুতি-প্যান্টের করুণ কলরব
শেষ হয়ে যায়।
এখন মরিচা-পড়া সমস্ত পুরানো তালাচাবির গরব
মৎস্যের আহার হতে চায়।

এখন আমরা এক ভিন্ন লোকালয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছি।
এখন আমরা যেন আর-এক সময়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছি।
এখন আমরা ভয়ে-ভয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আমাদের বন্ধুগুলি ক্রমে যেন আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার
বন্ধু হয়ে যায়।

ক্রমেই আঁটসাঁট হয় আমাদের পাতলুন-পাঞ্জাবি।
নামের অক্ষরগুলি মুছে দিয়ে আদি নির্মাতার
আমাদের পুঁথিপত্র ধীরে-ধীরে যেন সব তাৎপর্য হারায়।
এখন মরিচা-পড়া আমাদের তোরঙ্গের চাবি
শুয়ে আছে মৎস্যের পাড়ায়।

শব্দের পাথরে

জলের উপরে ঘুরে ঘুরে
জলের উপরে ঘুরে ঘুরে
ছোঁ মেরে মাছরাঙা ফের ফিরে গেল বৃক্ষের শাখায়।
ঠোঁটের ভিতরে তার ছোট্ট একটা মাছ ছিল।
কে জানে মাছরাঙা খুব সুখী কিনা।

রোদ্দুরে ভীষণ পুড়ে পুড়ে
রোদ্দুরে ভীষণ পুড়ে পুড়ে
সন্ধ্যায় অনন্তলাল ফিরেছে অভ্যস্ত বিছানায়।
মস্তিষ্কে তখনও তার রূপকথার গাছ ছিল ;
গাছের উপরে ছিল হিরামন পাখি।
কে জানে অনন্তলাল সুখী কিনা।

শব্দের পাথরে মাথা খুঁড়ে
শব্দের পাথরে মাথা খুঁড়ে
কেউ কি কখনও মাছ, বৃক্ষ কিংবা পাখির কঙ্কাল পেয়ে যায় ?

ভাবতেই ভীষণ হাসি পাচ্ছিল।

নিয়ন-মণ্ডলে, অন্ধকারে

যে যার জিজ্ঞাসাগুলি এবারে গুছিয়ে নাও।
কেননা, আর সময় নেই,
বিকেল-পাঁচটায় আমরা নিয়ন-মণ্ডলে যাব।
সেখানে সেই প্রৌঢ় পালোয়ানের সঙ্গে আমাদের
খুব জরুরী একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে,
তিন বছর আগে যাঁর শেষ প্রেস-কনফারেন্সে
আমরা উপস্থিত ছিলাম। এবং
নরম ডাঁটা দিয়ে ইলিশমাছের পাতলা ঝোল খেতে তাঁর ভাল লাগে কিনা
এই প্রশ্নের উত্তরে যিনি বলেছিলেন,
"দিবারাত্রি কবিতা লেখাই আমার হবি।"

ঢোলা-হাতা মলমলের কামিজ পরনে,
নিয়ন-মণ্ডলে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।
আমাদের দেখেই তিনি ভীষণভাবে ডানা ঝাপটাতে লাগলেন ; এবং
তৎক্ষণাৎ সেই মুরগীর উপমা আমাদের মাথায় এল,
যে কিনা এক্ষুনি একটা ডিম পাড়তে ইচ্ছুক।
কিন্তু ডিম না-পেড়েই তিনি বললেন,
"আগে কি তোমরা একটা ওমলেট খেতে চাও ?"
আমরা বললুম, "না।
তার চাইতে আপনার উপলব্ধির কথাটাই বরং বলুন।"
শুনে তিনি হাস্য করলেন। এবং
বুকের ভিতরে তাঁর চতুর্দশ উজ্জ্বল বাতিটা
জ্বালিয়ে তিনি জানালেন,
"চিরকাল নিয়ন-মণ্ডলে
অনেক কঠিন কাণ্ড-দেখা যায়। তবু
পাতলুনের দক্ষিণ পকেটে
বাঁ হাত ঢোকাবার চাইতে
কঠিন সার্কাস কিছু নেই।"

বাতিগুলি তখন দপদপ করে নিবে গেল।
দেখে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন,
আর্ত গলায় বললেন, "আমাকে একটা আয়না দাও,
এক্ষুনি আমি আমার মুখ দেখব।"
কিন্তু তাঁর পিসিমা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে,
অন্ধকারে কখনো নিজের মুখ দেখতে নেই।
তাই, তিনি মুখ দেখলেন না;
তার বদলে একটি কবিতা প্রসব করলেন।
তার আরম্ভটা এই রকম :
"অন্ধকারে কোথায় অশ্রুর
ধারা বহে যায়।
কে যেন নিজের মুখ চিরকাল দেখতে চেয়েছে
নিয়ন-মণ্ডলে, অন্ধকারে।"

নিদ্রিত স্বদেশে

পেটে-আসছে-মুখে-আসছে-না, সেই কথাটা, সেই
হঠাৎ-শুনতে-পাওয়া কথাটা আমি
ভুলে গিয়েছি।
যে-কথা অস্ফুট স্বরে তুমি একদিন
যে-কথা অর্ধেক রাত্রে তুমি একদিন
যে-কথা স্বপ্নের মধ্যে তুমি একদিন বলেছিলে।

স্বপ্নের মধ্যে কেউ যখন কথা বলে,
তখন তাকে খুব অচেনা মানুষ বলে মনে হয়।
তখন তার নিদ্রিত মুখের দিকে তাকালে আমার মনে হয়,
অনেক বড়-বড় সমুদ্র পেরিয়ে, তারপর

অনেক উঁচু-উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে, তারপর
সুদীর্ঘ প্রবাস-জীবনের শেষে সে তার স্বদেশে ফিরেছে।

একমাথা রুক্ষ চুল, পায়ে ধুলো,
ঘুমের মধ্যে সে তার স্বদেশে ফিরেছে।
ঘুমের মধ্যে সে তার আপন ভাষায় কথা বলছে।
প্রিয় গাভীটির গলকম্বলে হাত বুলোতে-বুলোতে
খুব গভীর স্বরে সে তার বাড়ির লোকজনদের জিজ্ঞেস করছে,
সে যখন বিদেশে ছিল, তখন তার
আঙুর-বাগানের পরিচর্যা ঠিকমত হত কিনা, তখন তার
খেতের আগাছা ঠিকমত নিড়িয়ে দেওয়া হত কিনা, তখন তার
গ্রামে কোনও বড়-রকমের উৎসব হয়েছিল কিনা।

ঘুমের মধ্যে কি এইসব প্রশ্ন করেছিলে তুমি ?
আমার মনে নেই।
পেটে-আসছে-মুখে-আসছে-না, সেই কথাটা, সেই
হঠাৎ-শুনতে-পাওয়া কথাটা আমি
ভুলে গিয়েছি।
যে-কথা অস্ফুট স্বরে তুমি একদিন
যে-কথা অর্ধেক রাত্রে তুমি একদিন
যে-কথা স্বপ্নের মধ্যে তুমি একদিন বলেছিলে।

জীবনে একবারমাত্র

'লাস্ট টাইম ! লাস্ট টাইম !'— যেন বুকের ভিতরে
ভীষণ শোরগোল ওঠে। শুনতে পাই
'লাস্ট টাইম ! লাস্ট টাইম !'— যেন

তটভূমি ধসে পড়ছে, ছলোচ্ছল ছলোচ্ছল
ঢেউ লাগছে নিরুপায় নৌকায়। রক্তের
পাতালবাহিনী নদী হঠাৎ ভীষণভাবে
ফুলে ফেঁপে ওঠে।—

আমি বালকবয়সে
ট্রেনের কামরায় কোনো বৃদ্ধ ফিরিঅলাকে একবার
আশ্চর্য মলম হাতে দারুণ বাঘের মত চেঁচাতে শুনেছি
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'— আমি
ঘাটশিলার হাটে এক লালাকে একবার
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!' বলে অসম্ভব পুরনো পেঁয়াজ
বিক্রি করে হাসতে দেখেছি।— আমি
মফস্বল-শহরে একবার
ঘণ্টা-হাতে সার্কাসের তাঁবুর বাইরে কাকে গম্ভীর গলায়
অন্ধকারে বলতে শুনেছি
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'— আমি গঙ্গার জেটিতে
সন্ধ্যায় লঞ্চের দড়ি তুলে নিতে-নিতে এক প্রবীণ মাল্লাকে
যেন জীবনে একবার
ভয়ঙ্কর আত্মমগ্ন বলতে শুনেছি
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'— কিন্তু বুকের ভিতরে
এই যে প্রলয়রোল শুনতে পাওয়া গেল,— কোনো বৃদ্ধ ক্যানভাসার,
ধূর্ত লালা, সার্কাসের দালাল অথবা
মাল্লার গলার সঙ্গে এর কোনো তুলনা হয় না।

জীবনে একবারমাত্র। রক্তের ভিতরে
জীবনে একবারমাত্র 'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!' এই বন্য মহারোল
শুনতে পাওয়া যায়, আমি শুনতে পাচ্ছি
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'— যেন
নিরুপায় নৌকার শরীরে
ছলোচ্ছল ছলোচ্ছল ঢেউ লাগছে। যেন
রক্তের পাতালগঙ্গা, দাঁড়ি-মাঝি-বৈঠা-হাল ইত্যাদি সমেত,

ভীষণ পাক খেতে-খেতে, ভীষণ পাক খেতে-খেতে
জলস্তম্ভ হয়ে গিয়ে ফুলে-ফেঁপে হঠাৎ স্বর্গের দিকে
দৌড়ে উঠে যায়।

একটাই মোমবাতি

একটাই মোমবাতি, তুমি তাকে কেন দুদিকে জ্বেলেছ ?
খুব অহঙ্কারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা যায়।
তুমি এত অহঙ্কারী কেন ?
চোখে চোখ রাখতে গেলে অন্য দিকে চেয়ে থাকো,
হাতে হাত রাখতে গেলে ঠেলে দাও,
হাতের আমলকী-মালা হঠাৎ টান মেরে তুমি ফেলে দাও,
অথচ তারপরে এত শান্ত স্বরে কথা বলো, যেন
কিছুই হয়নি, যেন
যা কিছু যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে।
খুব অহঙ্কারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা যায়।

অথচ এমন কাণ্ড করবার এখনি কোনো দরকার ছিল না।
অন্য কিছু না থাক, তোমার
স্মৃতি ছিল ; স্মৃতির ভিতরে
ভুবন-ভাসানো একটা নদী ছিল ; তুমি
নদীর ভিতরে ফের ডুবে গিয়ে কয়েকটা বছর
অনায়াসে কাটাতে পারতে। কিন্তু কাটালে না ;
এখনি দপ করে তুমি জ্বলে উঠলে ব্লাউজের হলুদে।

খুব অহঙ্কারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা যায়।
তুমি এত অহঙ্কারী কেন ?
একটাই মোমবাতি, তবু অহঙ্কারে তাকে তুমি দুদিকে জ্বেলেছ

কবিতা, কল্পনালতা

ভালবাসলে শান্তি হয়, কিন্তু আমি কাকে আজ ভালবাসতে পারি?
কবিতাকে? কবিতার অর্থ কী? কবিতা
বলতে কি এখনও আমি কল্পনালতার ছবি দেখে যাব?
যে-ছবি সকলে দেখে, যে-ছবি দেখবার জন্যে অনেকে এখনও,
এখনও অর্থাৎ এই উনিশ শো পঁয়ষট্টি সনে
হরেক অদ্ভুত কর্মে সারা দিন আঙুল বাঁকিয়ে তবু বসে থাকে
অচিরে কুয়াশা কাটবে এই নাবালক প্রতীক্ষায়?
আমিও কি বসে থাকব? আমিও কি একবার বুঝব না
কুয়াশার অন্তরালে অন্য কোনও মূর্তি নেই?
এই অবয়বহীন ধবধবে দৃশ্যের আড়ালে
অন্য কোনও দৃশ্য নেই,
থাকলেও দ্বিতীয় এক কুয়াশার দৃশ্য পড়ে আছে,
জেনে কি একেই আমি কবিতার সম্মান দেব না?
কবিতা মানে কি আজও কল্পনালতায় কিছু কুসুম ফোটানো?
কবিতা মানে কি এই কুয়াশার ভিতরে একবার
বাঘ সিংহ হায়েনা ইত্যাদি
পশুর দাঁতের শক্তি বুঝে নেওয়া নয়?

স্পষ্ট কথাটাকে আজ অন্তত একবার খুব স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ভাল।
অন্তত একবার আজ বলা ভাল,
যা-কিছু সামনে দেখছি, ধোঁয়া বা পাহাড় কিংবা পরস্পর আলাপনিরত
ক্ষিপ্র পশু—
হয়ত এ ছাড়া কোনও দৃশ্য নেই।
বলা ভাল,
কল্পনালতার ফুল কুয়াশা কাটলেও কেউ দেখতে পাবে না।
কেননা কুয়াশা আজ প্রত্যেকের মগজে ঢুকেছে। তাই
কবিতাকে ভালবেসে, ক্রমাগত ভালবেসে-বেসে
তোমাকে আমাকে আজ অন্তত একবার

ভিতরে-বাহিরে ব্যাপ্ত এই অন্তহীন কুয়াশায়
আলাপে উৎসুক ধূর্ত বাঘের খাঁচার মধ্যে হেঁটে যেতে হবে

বাতাসী

'বাতাসী ! বাতাসী !'— লোকটা ভয়ঙ্কর চেঁচাতে চেঁচাতে
গুমটির পিছন দিকে ছুটে গেল।
ধাবিত ট্রেনের থেকে এই দৃশ্য চকিতে দেখলুম।
কে বাতাসী ? জোয়ান লোকটা অত ভয়ঙ্করভাবে
তাকে ডাকে কেন ? কেন
হাওয়ার ভিতরে বাবরি-চুল উড়িয়ে
পাগলের মত
'বাতাসী ! বাতাসী !' বলে ছুটে যায় ?

টুকরো-টুকরো কথাগুলি ইদানীং যেন বড় বেশী
গোঁয়ার মাছির মত
জ্বালাচ্ছে। কে যেন কাকে বাসের ভিতরে
বলেছিল, 'ভাবতে হবে না,
এবারে দুদ্দাড় করে হেমাঙ্গ ভীষণভাবে উঠে যাবে, দেখে নিস।'
কে হেমাঙ্গ ? কে জানে, এখন
সত্যিই দুদ্দাড় করে সে কোথাও উঠে যাচ্ছে কি না।
কিংবা সেই ছেলেটা, যে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে পাশের
মেয়েটিকে অদ্ভুত কঠিন স্বরে বলেছিল,
'চুপ করো, নাহলে আমি
সেইরকম শাস্তি দেব আবার—' কে জানে
'সেইরকম' মানে কী-রকম। আমি ভেবে যাচ্ছি,

ক্রমাগত ভেবে যাচ্ছি, তবু
গল্পের সবটা যেন নাগালে পাচ্ছি না।

গল্পের সবটা আমি নাগালে পাব না।
শুধু শুনে যাব। শুধু এখানে-ওখানে,
জনারণ্যে, বাসের ভিতরে, হাটেমাঠে,
অথবা ফুটপাথে, কিংবা ট্রেনের জানলায়
টুকরো-টুকরো কথা শুনব, শুধু শুনে যাব। আর
হঠাৎ কখনো কোনো ভুতুড়ে দুপুরে
কানে বাজবে: 'বাতাসী! বাতাসী!'

অমানুষ

শিম্পাঞ্জী, তোমাকে আজ বড় বেশী বিমর্ষ দেখলুম
চিড়িয়াখানায়। তুমি ঝিলের কিনারে
দারুণ দুঃখিতভাবে বসে ছিলে। তুমি
একবারও উঠলে না এসে লোহার দোলনায়;
চাঁপাকলা, বাদাম, কাবলি-ছোলা— সবকিছু
উপেক্ষিত ছড়ানো রইল। তুমি ফিরেও দেখলে না।
দুঃখী মানুষের মত হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজে
ঝিলের কিনারে শুধু বসে রইলে। একা।

শিম্পাঞ্জী, তোমাকে কেন এত বেশী বিমর্ষ দেখলুম?
কী দুঃখ তোমার? তুমি মানুষের মত
হতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ বছরের সিঁড়ি
ভেঙে এসেছিলে, তবু মাত্রই কয়েকটা সিঁড়ি টপকাবার ভুলে

মানুষ হওনি। এই দুঃখে তুমি ঝিলের কিনারে
বসে ছিলে নাকি?

শিম্পাঞ্জী, তোমাকে আজ বড় বেশী দুঃখিত দেখলুম।
প্রায় হয়েছিলে, তবু সম্পূর্ণ মানুষ
হওনি, হয়ত সেই দুঃখে তুমি আজ
দোলনায় উঠলে না; তুমি ছেলেবুড়ো দর্শক মজিয়ে
অর্ধমানবের মত নানাবিধ কায়দা দেখালে না।
হয়ত দেখনি তুমি, কিংবা দেখেছিলে,
দর্শকেরা পুরোপুরি বাঁদুরে কায়দায়
তোমাকে টিট্‌কিরি দিয়ে বাঘের খাঁচার দিকে চলে গেল

তার চেয়ে

সকলকে জ্বালিয়ে কোনো লাভ নেই।
তার চেয়ে বরং
আজন্ম যেমন জ্বলছ ধিকিধিকি, একা
দিনরাত্রি
তেমনি করে জ্বলতে থাকো,
জ্বলতে জ্বলতে ক্ষয়ে যেতে থাকো,
দিনরাত্রি
অর্থাৎ মুখের
কশ বেয়ে যতদিন রক্ত না গড়ায়।

একদিন মুখের কশ বেয়ে
রক্ত ঠিক গড়িয়ে পড়বে।

ততদিন তুমি কী করবে ?
পালিয়ে পালিয়ে ফিরবে নাকি ?

পালিয়ে পালিয়ে কোনো লাভ নেই।
তার চেয়ে বরং
আজন্ম যেমন আছ, একা
পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে
দিনরাত্রি
তেমনি করে জ্বলতে থাকো,
জ্বলতে জ্বলতে ক্ষয়ে যেতে থাকো,
দিনরাত্রি
অর্থাৎ নিয়তি
যতদিন ঘোমটা না সরায়।

নিয়তির ঘোমটা একদিন
হঠাৎ সরবে।
সরে গেলে তুমি কী করবে ?
মুখে রক্ত, চোখে অন্ধকার
নিয়ে তাকে বলবে নাকি "আর যেন না-জ্বলি' ?

না না, তা বোলো না।
তার চেয়ে বরং
বোলো, "আমি দ্বিতীয় কাউকে
না-জ্বালিয়ে একা-একা জ্বলতে পেরেছি,
সেই ভাল ;
আগুনে হাত রেখে তবু বলতে পেরেছি,
'সবকিছু সুন্দর'—
সেই ভালো।"
বোলো যে, এ ছাড়া কিছু বলবার ছিল না।

রাজপথে কিছুক্ষণ

দেখুন মশায়,
অনেকক্ষণ ধরে আপনি ঘুরঘুর করছেন,
কিন্তু আর নয়, এখন আপনার সরে পড়াই ভাল।
এই আমি হলফ করে বলছি,
কলকাতা থেকে কৈম্বাটুর অব্দি একটা
প্যাসেনজার বাস-সারভিস খুলবার সত্যিই খুব দরকার আছে কিনা,
তা আমি জানিনে।
আপনার যদি মনে হয়, আছে,
তাহলে, বেশ তো, যান,
যেখানে যেখানে সিন্নি দেবার, দিয়ে,
জায়গামতন ইনফ্লুয়েন্‌স খাটিয়ে
লাইসেন্‌স পারমিট ইত্যাদি সব জোগাড় করুন.
যাঁকে যাঁকে ধরতে হয়, ধরুন,
আমাকে আর জ্বালাবেন না। আমি
নেহাতই একজন ছাপোষা লোক,
টাইমের ভাত খেয়ে আপিস যাই,
অবসর-টবসর পেলে ছোট মেয়েটাকে নামতা শেখাই,
কৈম্বাটুর যে কোথায়,
মাদ্রাজে না পাঞ্জাবে, তাই আমি জানিনে।
আপাতত তাড়াতাড়ি
শ্যামবাজারে যাওয়া দরকার, ভাগ্যবলে যদি একটা
শাট্‌ল-বাস পাই,
তাহলেই আমি আজকের মতন ধন্য হতে পারি।

দেখুন মশায়,
সেই থেকে আপনি আমার সঙ্গে সেঁটে আছেন।
কিন্তু আর নয়, এখন আপনার সরে পড়াই ভাল। আপনি
বিশ্বাস করুন চাই না-করুন,

দুই হাতের পাতা উল্‌টে দিয়ে এই আমি
শেষবারের মতন জানালুম, কেন
কৃষ্ণমাচারী গেলেন
এবং শচীন চৌধুরী এলেন,
তার বিন্দুবিসর্গও আমি জানিনে।
আমি একজন থিনিকেষ্ট,
কলম পিষতে বড়বাজারে যাই,
পিষি,
সাবান কিংবা তরল আলতার শিশি
কিনে বাড়ি ফিরি, গিন্নী
কলঘরে ঢুকলে বাচ্চা সামলাই।
আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করা না-করা সমান,
ভোটারদের আল্‌জিভ না দেখিয়ে যাঁরা বক্তৃতা দিতে পারেন না,
আপনি বরং তাঁদের কাছে যান।
আমার এখন তাড়াতাড়ি
শ্যামবাজারে যেতে হবে। সঙ্গে যদি আসতে চান, আসুন,
লজ্জা-টজ্জা না-করে একটু শব্দ করে কাসুন,
তাহলেই আপনার বাসভাড়াটা চুকিয়ে দিতে পারি।

নক্ষত্র জয়ের জন্য

হুশ করে নক্ষত্রলোকে উঠে যেতে চাই।
কিন্তু তার জন্য, মহাশয়,
স্প্রিং-লাগানো দারুণ মজবুত একটা শব্দের দরকার
সেইটের উপরে গিয়ে উঠতে হবে।

প্রাণপণে বাতাস টেনে ফুসফুস ফুলিয়ে
নক্ষত্রলোকের দিকে গর্বিত ভঙ্গিতে একবার
চোখ রাখতে হবে।
তারপরে প্রাণপণ জোরে লাথি মারতে হবে সেই শব্দের পাঁজরে
আসলে কী ব্যাপার জানেন,
রক্তের ভিতরে একটা বিপরীত বিরুদ্ধ গতিকে
সঞ্চারিত করা চাই।

একটা শব্দ চাই, একটা শব্দ চাই, মহাশয়।
নক্ষত্রজয়ের শব্দ কিছুতে পাচ্ছি না। তাই
আপাতত
কুকুরের মত একটা বশংবদ শব্দ দিন,
যেটাকে পায়ের কাছে কিছুক্ষণ ইচ্ছেমত নাচিয়ে খেলিয়ে,
ঘাড়ে ধরে, ঘরের বাইরে বারান্দায়
ছুঁড়ে দিতে পারি।
সুপুরির মত একটা শব্দ দিন,
যেটাকে দাঁতের মধ্যে ভেঙে পিষে ছাতু করে দিয়ে
থুতুতে মিশিয়ে আমি ঘৃণাভরে চারদিকে ছিটিয়ে দিতে পারি।
কিংবা— কিংবা—
বুঝতেই পারছেন, সব নাট-বল্টু একে-একে খুলে যাচ্ছে ;
বুঝতেই পারছেন, নৌকো ফেঁসে যাচ্ছে ;
বুঝতেই পারছেন, আমি ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি, মহাশয়।

'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর।'
আমি একটা শব্দ খুঁজছি, মহাশয়।
নক্ষত্রলোকের দিকে যাব বলে আমি
চল্লিশ বছর ধরে হাটেমাঠে টই-টই রোদ্দুরে
বিস্তর শব্দের ঘাড় মটকালুম। অথচ দেখুন,
'আচমন'-এর তুল্য কোনো সুলক্ষণ শব্দ আমি এখনো পাইনি।
দুই কশে গড়াচ্ছে রক্ত, চক্ষু লাল, বুকের ভিতরে
গনগনে আগুন জেলে

চল্লিশ বছর ধরে শুধু আমি হাতের চেটোর উলটো পিঠে
কপাল ঘষছি।

অথচ ভাবুন,
কিছু সুলক্ষণ শব্দ হাতের সামনেই ছিল কিনা।
বহু সুলক্ষণ শব্দ হাতের সামনেই ছিল, কিন্তু আমি আজ
আচমকা তাদের দেখলে চিনতে পারি না।
একদা-দুর্দান্ত-কিন্তু-রকবাজের-হাতে-পড়ে-নষ্ট-হয়ে-যাওয়া
সমুন্নত সুন্দর-ললাট বহু শব্দ ইদানীং
হাড্ডিসার, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফোঁকে।
জাহাজ, পতন, মৃত্যু, মাস্তুল প্রমুখ
পরাক্রান্ত শব্দগুলি
এখন ক্রমেই
ইঁদুরের মতন ছুঁচলো-মুখ হয়ে যাচ্ছে, মহাশয়।
পাউডার-পমেড-মাখা যে-কোনো ছোকরার
পুরনো কম্বলে লাথি ঝাড়লেই 'পতন' 'মৃত্যু' 'মাস্তুল' ইত্যাদি
ইঁদুর কিচকিচ করে ওঠে।

কিচকিচ কিচকিচ, শুধু কিচকিচ কিচকিচ ছাড়া ইদানীং
অন্য-কোনো ধ্বনি
শুনতে পাই না।
শুধুই লোভের ধূর্ত মার্কামারা মুখ ভিন্ন অন্য-কোনো মুখ
দেখতে পাই না।
বুঝতেই পারছেন, সব নাট-বল্টু একে-একে খুলে যাচ্ছে ;
বুঝতেই পারছেন, নৌকো ফেঁসে যাচ্ছে ;
বুঝতেই পারছেন, আমি ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি, মহাশয়।
অথচ এখনো আমি সুলক্ষণ একটা-কোনো শব্দের উপরে
সওয়ার হবার জন্যে বসে আছি।
অথচ এখনো আমি নক্ষত্রলোকের দিকে যেতে চাই।
অথচ এখনো আমি জ্যোৎস্নায় কুলকুচো করব,
এইরকম আশা রাখি।

একটা শব্দ দিন, একটা শব্দ দিন, মহাশয়।
রক্তের ভিতরে ঘোর ভলস্তুল ঘটিয়ে যা মুহূর্তে আমাকে
শূন্যলোকে ছুঁড়ে দেবে—
চাঁদমারি-খসানো আমি এমন একটাই মাত্র শব্দ চাই।
নেই নাকি?
তবে দিন,
বুলেটের মত একটা শব্দ দিন। আমি
যেটাকে বন্দুকে পুরে, ট্রিগারে আঙুল রেখে— কড়াক পিং
নকল বুঁদির কেল্লা ভেঙে দিয়ে ফাটা কপালের রক্ত মুছে
হেসে উঠতে পারি।

দেখা-শোনা, ক্বচিৎ কখনো

সর্বদা দেখি না, শুধু মাঝে-মাঝে দেখতে পাই।
যেমন গভীর রাত্রে, অন্ধকারে,
ক্বচিৎ কখনো
দুঃখের তাপিত বুক, বুকের উন্মত্ত ওঠানামা
করতলে ধরা পড়ে।
যেমন সমস্ত কিছু আঙুলের চক্ষু দিয়ে দেখা যায়।
সেইমতো।
যে-শরীর কোথাও দেখিনি, তার নতজানু অর্পিত ভঙ্গিমা;
যে-ওষ্ঠ কোথাও নেই, তার নিমন্ত্রণ;
যে-কঙ্কণ কোথাও ছিল না, তার রিনিঠিনি;
যে-আতর কোথাও বাসিনি, তার মাতাল সুবাস—
সব দেখা যায়।

সর্বদা শুনি না, শুধু মাঝে-মাঝে শুনতে পাই।
যেমন বধির তার কবজির ঘড়িকে
কপালে ঠেকায় ;
ঠেকিয়ে, যন্ত্রের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক ধ্বনি
শুনে নেয় ;
যেমন ললাট-লিপি তা-ই তার।
সেইমতো।
শ্রবণে পড়ে না ধরা যত কিছু, যা-কিছু। রাত্রির
খরস্রোত প্রতীক্ষার
বিশাল ধুকধুক। ঘন অন্ধকারে
নয়নের তরল আগুন। যেন আগুনের মধ্যে যে বাসনা
পুড়ে যাচ্ছে, এইমাত্র তার
শব্দহীন অথচ বুকের-রক্ত-জমানো ভীষণ আর্তনাদ
শোনা গেল

দুপুরবেলায় নিলাম

অকস্মাৎ কে চেঁচিয়ে উঠল রক্তে ঝাঁকি দিয়ে
নিলাম নিলাম নিলাম !”
আমি তোমার বুকের মধ্যে উঁকি মারতে গিয়ে
চমকে উঠেছিলাম।

অথচ কেউ কোথাও নেই তো, খাঁখাঁ করছে বাড়ি
পিছন দিকে ঘুরে
দেখেছিলাম, রেলিং থেকে ঝাঁপ দিয়েছে শাড়ি
একগলা রোদ্দুরে।

বারান্দাটা পিছন দিকে. ডাইনে বাঁয়ে ঘর,
সামনে গাছের সারি।
দৃশ্যটা খুব পরিচিত, এখনো পর-পর
সাজিয়ে নিতে পারি।

এবং স্পষ্ট বুঝতে পারি, বুকের মধ্যে কার
বুকের শব্দ বাজে।
হায়, তবু সেই দ্বিপ্রাহরিক নিলাম-ঘোষণার
অর্থ বুঝি না যে।

"নিলাম নিলাম!" কিসের নিলাম? দুপুরে দুঃসহ
সকালবেলার ভুলের?
একবেণীতে ক্ষুব্ধ নারীর বুকের-গন্ধবহ
বাসী বকুল ফুলের?

"নিলাম নিলাম!" ঘণ্টা বাজে বুকের মধ্যে, আর
ঘণ্টা বাজে দূরে।
"নিলাম নিলাম!" ঘণ্টা বাজে সমস্ত সংসার
সারা জীবন জুড়ে।

কিচেন গারডেন

ফুটেছ গোলাপ তুমি কলকাতার কিচেন গারডেনে।
বিলক্ষণ অন্যায় করেছ। তুমি জানো,
এখন খাদ্যের খুব অনটন।
এখন চিচিঙ্গে, লাউ, ট্যাঁড়শের উদ্দেশে ধাবিত
জনতাকে ফেরানো যাবে না
অন্য দিকে।

বাড়ির হাতায়, শীর্ষে, বারান্দায়, ঝুলন্ত কারনিসে
যেখানে যেটুকু ফালতু জায়গা ছিল্—
ইনচি-সেনটিমিটারের চৌখুপী বিন্যাসে সব বুঝে নিয়ে
এখন সবাই
বাতিল কড়াই, গামলা, কাঠের বারকোষে
পালং, বরবটি, শিম, ধানী লঙ্কা
ইত্যাদি বসিয়ে যাচ্ছে।

তারই মধ্যে নিঃশব্দে দিয়েছ তুড়ি, ফুটেছ গোলাপ।
অন্যায় করেছ।
"আরেব্বাস, কত বড় গোলাপ ফুটেছে!"—
কে যেন উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলেছিল ; কিন্তু তার ভোটার জোটেনি।
জনতা হুড়মুড় করে প্রাইভেট বাসের
বাম্‌পারে দাঁড়িয়ে গিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে উঠল : গোলদিঘি চলো হে।

শুধুই গোলদিঘি বলে কথা নেই। উত্তরে দক্ষিণে
সমস্ত কলকাতা
জুড়ে আজ চমৎকার সবজির বাগান
জমে উঠছে।
শুধুই গোলাপ বলে কথা নেই। সমস্ত ফুলের
বোঁটাসুদ্ধ খেয়ে ফেলছে চ্যাপলিনী তামাশা।
সবাই টোমাটো, উচ্ছে, ধুঁধুলের মধ্যে ডুবে গিয়ে
মনে মনে
অঙ্ক কষছে, কোথায় কতটা জমি এক লপ্তে চষে ফেলা যায়—
গঙ্গার জেটিতে, ডকে, নির্বাচনী মিটিঙে, সন্ধ্যার
ময়দানে অথবা শতবার্ষিকী ভবনে।

স্নানযাত্রা

বাইরে এসো···কে যেন বুকের মধ্যে
বলে ওঠে···বাইরে এসো...এখুনি আমার
বুকের ভিতরে কার
স্নান সমাপন হোলো!

সারাদিন ঘুরেছি অনেক দূরে দূরে।
তবুও বাইরে যাওয়া হোলো না। ঘরের
ভিতরে অনেক দূরে দূরে
পা ফেলেছি। ঘরের ভিতরে
দশ বিশ মাইল আমি ঘুরেছি। এখন
সন্ধ্যায় কে যেন ফের বুকের ভিতরে
বলে উঠল : এসো।

বাইরে এসো···কে যেন বুকের মধ্যে ঘড়ির ঘণ্টায়
বলে যাচ্ছে। এখুনি আমার
বুকের ভিতরে যেন কার
অবগাহনের পালা সমাপন হোলো।

প্রতীকী সংলাপ

"দিনমান তো বৃথাই গেল, এখন আমার যুদ্ধ;
এখন আমার অস্ত্রসজ্জা সব কিছুর বিরুদ্ধে।"
বলেই তিনি হাত বাড়িয়ে নিলেন পদ্মফুল।

"এটা কেমন যুদ্ধ? সাদা পদ্মফুলের কান্তি
যে বস্তুটার প্রতীক, সেটা নিতান্তই যে শান্তি।"
দ্বিতীয়জন তন্মুহূর্তে ধরিয়ে দিলেন ভুল।

"তবে বৃথাই বর্ম আঁটো সাজাও চতুরঙ্গ,
এখন আমি সন্ধি করব ঈশ্বরের সঙ্গে।"
বলেই তিনি পদ্ম ফেলে গোলাপ তুলে নিলেন।

"এটা কেমন সন্ধি? জানে সবাই জগৎসুদ্ধ—
গোলাপ ঝরায় রক্তধারা, গোলাপ মানেই যুদ্ধ।"
দ্বিতীয়জন পুনশ্চ তাঁর ভুল ধরিয়ে দিলেন।

আমরা দেখছি খেলায় মত্ত প্রতীকী উদ্‌ভ্রান্তি।
রৌদ্রে ভাসে চবুতরা, ছায়ায় ভাসে খিলেন।
ভুল ঠিকানায় ঘুরে বেড়ায় যুদ্ধ এবং শান্তি।

প্রবাস-চিত্র

যেখানে পা ফেলবি, তোর মনে হবে, বিদেশে আছিস।
এই তোর ভাগ্যলিপি।
গাছপালা অচেনা লাগবে, রাস্তাঘাট
অন্যতর বিন্যাসে ছড়ানো,
সদরে সমস্ত রাত কড়া নাড়বি, তবু
বাড়িগুলি নিদ্রার গভীর থেকে বেরিয়ে আসবে না।
এই তোর ভাগ্যলিপি।
সকলে বলবে না কথা; যারা বলবে,
তারা পর্যটন বিভাগের কর্মী মাত্র,
যে-কোনো টুরিস্‌টকে তারা দুটি-চারটি ধোপদুরস্ত কথা
উপহার দিয়ে থাকে,
তার জন্যে মাসান্তে মাইনে পায়।
এই তোর ভাগ্যলিপি।

যেখানেই যাবি, তোর মনে হবে, এইমাত্র উড়োজাহাজের
পেটের ভিতর থেকে ভিন্ন-কোনো ভূমির উপরে
নেমে এসেছিস।
এই তোর ভাগ্যলিপি।
কাপড় সরিয়ে কেউ বুকের রহস্য দেখাবে না।

কেন যাওয়া, কেন আসা

অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে ভালবাসা,
পাখিটা সব বুঝতে পারে।
কেন যাওয়া, গিয়েও কেন ফিরে আসা,
নিষেধ কেন চার দুয়ারে।
এবং কেন ফোটাও আলোর পরিভাষা
খাঁচার মধ্যে, অন্ধকারে।

পাখি জানে, ঘরের বাইরে নদী পাহাড়
লুঠ করে নেয় সকল সোনা,
দূরের দর্জি মেঘে বসায় রুপালী পাড় :
দূরে তোমার সায় ছিল না।
কিন্তু এই যে চাবির গোছা, এও তো তোমার
মস্ত বড় বিড়ম্বনা।

পাখিটা সব বুঝতে পারে, চালাক পাখি
তাই আসে ফের খাঁচার ধারে।
আমিও তেমনি রঙ্গমঞ্চে ঘুরতে থাকি
স্বর্গেমর্তে বারেবারে।
দূরে গিয়েও সেইমতো হাত বাড়িয়ে রাখি
বুকের মধ্যে, অন্ধকারে।

নিজের কাছে প্রতিশ্রুতি

বলেছিলে, দেবেই দেবে।
আজ না হক তো কাল, না হক তো পরশু দেবে।
আলোর পাখি এনে দেবে।
তবে কেন এখন তোমার এই অবস্থা ?
কথা রাখো, উঠে দাঁড়াও,
আবার দীর্ঘ বাহু বাড়াও আলোর দিকে।
আকন্দ ফুল মুখে রেখে ধুলোর মধ্যে শুয়ে আছ,
এই কি তোমার কথা রাখা ?
আমি তোমার দুই জানুতে নতুন শক্তি ঢেলে দিলাম,
আবার তুমি উঠে দাঁড়াও।
আমি তোমার ওষ্ঠ থেকে শুষে নিলাম সমস্ত বিষ,
আবার তুমি বাহু বাড়াও আলোর দিকে।
রাখো তোমার প্রতিশ্রুতি।

যে-দিকে চাই, দৃশ্যগুলি এখন একটু ঝাপসা দেখায় ;
জানলা তবু খোলা রাখি।
যে-দিকে যাই, নদীর রেখা একটু-একটু পিছিয়ে যায়।
বুঝতে পারি, অন্তরীক্ষে জলে-স্থলে
পাকিয়ে উঠছে একটা-কোনো ষড়যন্ত্র।
বুঝতে পারি, কেউ উচাটন-মন্ত্র পড়ছে কোনোখানে।
তাই আগুনের জিহ্বা এখন লাফ দিয়ে ছোঁয় আকাশটাকে
একটা-কিছু ব্যাপার চলছে তলে-তলে,
তাই বাড়িঘর খাঁখাঁ শূন্য, শুকিয়ে যাচ্ছে তরুলতা।
বুঝতে পারি, ক্রমেই এখন পায়ের তলায়
বসে যাচ্ছে আল্‌গা মাটি,
ধসে যাচ্ছে রাস্তা-জমি শহরে আর মফস্বলে।

তাই বলে কি ধুলোর মধ্যে শয্যা নেব ?
বন্ধ করব চক্ষু আমার ?

এখন আরও বেশীরকম টান্‌-বাঁধনে দাঁড়িয়ে থাকি।
দৃষ্টি ঝাপসা, তবুও জানি, চোখের সামনে
আজ না হক তো কাল, না হক তো পরশু আবার
ফুটে উঠবে আলোর পাখি।

বলেছিলে, দেবেই দেবে।
যেমন করেই পারো, তুমি আলোর পাখি এনে দেবে
তবে কেন ধুলোর মধ্যে শুয়ে আছ ?
আবার তুমি উঠে দাঁড়াও।
তবে কেন আকন্দ ফুল মুখে তোমার ?
আবার দীর্ঘ বাহু বাড়াও আলোর দিকে।
আজ না হক তো কাল, না হক তো পরশু তুমি
পাখিটাকে ধরে আনবে, কথা ছিল।
এই কি তোমার কথা রাখা ?
উঠে দাঁড়াও, রাখো তোমার প্রতিশ্রুতি।

নিজের কাছে স্বীকারোক্তি

আমি পাহাড় থেকে পড়তে পড়তে
তোমাকে ধরে বেঁচে রয়েছি, কবিতা।
আমি পাতালে ডুবে মরতে মরতে
তোমাকে ধরে আবার ভেসে উঠেছি।
আমি রাজ্যজয় করে এসেও
তোমার কাছে নত হয়েছি, কবিতা।
আমি হাজার দরজা ভালবেসেও
তোমার বন্ধ দুয়ারে মাথা কুটেছি।

কখনো এর, কখনো ওর দখলে
গিয়েও ফিরি তোমারই টানে, কবিতা ;
আমাকে নাকি ভীষণ জানে সকলে,
তোমার থেকে বেশী কে জানে, কবিতা ?

আমি ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াই,
গোপন রাখি সকল শোক, কবিতা।
আমি শ্মশানে ফুল ঘটাব, তাই
তোমার বুকে চেয়েছি ঢেউ রটাতে।
আমি সকল সুখ মিথ্যে মানি,
তোমার সুখ পূর্ণ হোক, কবিতা।
আমি নিজের চোখ উপড়ে আনি,
তোমাকে দিই, তোমার চোখ ফোটাতে।
তুমি তৃপ্ত হও, পূর্ণ হও,
জ্বালো ভূলোক, জ্বালো দ্যুলোক, কবিতা।

দুপুরবেলা বিকেলবেলা

॥ ১ ॥

কথা ছিল, ঘরে যাব : 'ঘর হৈল পর্বতপ্রমাণ'।
চেয়ে দেখি, দিগন্ত অবধি
দুপুরেই এঁকে দিচ্ছ সমস্ত স্বপ্নের অবসান।

বয়সের নদী
আঁজলায় সামান্য জল তুলে ধরে। বুকের ভিতরে
যতখানি জল, তার চতুর্গুণ নুড়ির ছলনা।
খরায় শুকিয়ে ওঠে ধান।

॥ ২ ॥

সারা দুপুর খরায় তোমার ধান পুড়েছে।
বিকেলবেলা
হঠাৎ শুরু উথালপাথাল জলের খেলা।
জল ঘুরে যায়, জল ঘুরে যায় নিখিলবিশ্বচরাচরে--
আমার ঘরে, তোমার ঘরে।

সভাকক্ষ থেকে কিছু দূরে

কী করলে হাততালি মেলে, বিলক্ষণ জানি ;
কিন্তু আমি হাততালির জন্যে কোনোদিন
প্রলুব্ধ হব না।
তোমার চারদিকে বহু কিঙ্কর জুটেছে, মহারানী।
ইঙ্গিত করলেই তারা ক্রিরিরিং
ঘড়িতে বাজিয়ে ঘণ্টি অদ্ভুত উল্লাসে গান গায়।
আমিও দু-একটা গান জানি,
কিন্তু আমি কোরাসের ভিতরে যাব না।
মহারানী,
যেমন জেনেছি, ঠিক সেইরকম উচ্চারণে বাজাব তোমাকে

তুমি সিংহাসনে খুব চমৎকার ভঙ্গিতে বসেছ।
দেখাচ্ছ ধবল গ্রীবা, বুকের খানিক ;
ধরেছ সুমিষ্ট ইচ্ছা চক্ষুর তারায়,
বাঁ হাতে রেখেছ থুতনি, ডান হাতে
খোঁপা থেকে দু-একটা নির্মল জুঁই খুঁটে নিচ্ছ,
ছুঁড়ে দিচ্ছ সভার ভিতরে।

কিন্তু মহারানী, আমি তোমাকে আর একটু বেশী জানি।
ইঙ্গিত করলেই তাই ক্রিরিরিং
ঘড়িতে ঘণ্টির তাল বাজাতে পারি না।
বাজিয়ে দেখেছি, তবু বুকের ভিতরে বহু জমিজমা
অন্ধকার থাকে।
সভাকক্ষ থেকে তাই কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছি।
মহারানী,
অন্তত একদিন তুমি অনুমতি দাও,
যেমন জেনেছি, ঠিক সেইরকম উচ্চারণে বাজাব তোমাকে।

পূর্ব গোলার্ধের ট্রেন

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়।
হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসি।
মনে হয়,
ঘণ্টা পড়ে গেছে, ট্রেন আসতে আর দেরি নেই।
অথচ বিছানাপত্র, তোরঙ্গ, জলের কুঁজো— সব-কিছু
ছত্রখান হয়ে আছে।
আমি খুব দ্রুত হাতে ওয়েটিং রুমের সেই ছড়ানো সংসার
গুছিয়ে তুলতে থাকি।
বাইরে হুলুস্থুল চলছে, ইনজিনের শানটিং, লোহার-
চাকাওয়ালা গাড়ি ছুটছে, হাজার পায়ের শব্দ,
আলো ছায়া আলো ছায়া,
উন্মাদের মতন কে যেন
তারই মধ্যে
পরিত্রাহি ডেকে যাচ্ছে : কুলি, কুলি, এই দিকে, এ-দিকে।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়।
হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসি, চারদিকে তাকিয়ে
কিচ্ছুই বুঝি না।
আমি কেন ওয়েটিং রুমের মধ্যে, প্রাচ্যের সুন্দরী ভীরু বালিকার মতো,
সংসার গুছিয়ে তুলছি মধ্য রাতে ?
আমি কেন ছিটকিয়ে-ছড়িয়ে-যাওয়া পুঁতিগুলি
খুঁটে তুলছি ?
আমি কি কোথাও যাব ? কোনোখানে যাব ?
আমি কি ট্রেনের জন্যে প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে
ঘুমিয়ে পড়েছি ?

ইদানীং এই রকম ঘটছে। ইদানীং
শব্দে-শব্দে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মধ্য রাতে
টুপটাপ শিশির ঝরলে চমকে উঠি ; মনে হয়,
দেড় কাঠা উঠোন, তার স্বত্ব নিয়ে
স্বর্গে-মর্তে ঘোরতর সংঘাত চলেছে।
অন্ধকারে
বৃষ্টির ঝর্ঝর শুনলে মনে হয়,
দুদিকে পাহাড়, তার হৃৎপ্রদেশে
আচম্বিতে ট্রেনের চাকার শব্দ বেজে উঠল।
অথচ কোথায় ট্রেন, উদ্ধারের-সম্ভাবনাহীন
যাত্রীদের বুকে নিয়ে কোনখানে চলেছে, আমি
কিচ্ছুই বুঝি না—
সূর্যকে পিছনে রেখে
পূর্ব গোলার্ধের থেকে পশ্চিম গোলার্ধে কোন্ নরকের দিকে।

সাংকেতিক তারবার্তা

সারাদিন আলোর তরঙ্গ থেকে ধ্বনি জাগে :
দূরে যাও।
সারারাত্রি অন্ধকার কানে-কানে মন্ত্র দেয় :
দূরে যাও।
বাল্যবয়সের বন্ধু, পরবর্তী জীবনে তোমরা
কে কোথায়
কর্মসূত্রে জড়িয়ে রয়েছ, আমি খবর রাখি না।
কেউ কি অনেক দূরে রয়ে গেলে ?
কৈশোর-দিনের সঙ্গী, তোমরা কেউ কি
দূর ভুবনের মৃত্তিকায়
সংসার পেতেছ, তবু
কৈশোর-দিনের কথা ভুলতে পারনি ?
কিংবা যারা প্রথম-যৌবনে কাছে এসেছিলে,
তারাই কেউ কি
অজ্ঞাত বিদেশে আজ অবেলায়
পর্বতচূড়ায় উঠে অকস্মাৎ পূর্বাস্য হয়েছ ?
তোমরা কেউ কি
উন্মাদের মত ঢিল ছুঁড়ে যাচ্ছ স্মৃতির অতলে ?

আলোর অক্লান্ত ধ্বনি প্রাণে বাজে : দূরে যাও।
কেন বাজে ?
অন্ধকার কানে-কানে মন্ত্র দেয় : দূরে যাও।
কেন দেয় ?
অন্য জীবনের মধ্যে ডুব দিয়ে তবুও কেউ কি
পরিপূর্ণ ডুবতে পারনি ?
কেউ কি নিঃসঙ্গ দূর দ্বীপ থেকে উদ্ধার চাইছ ?
বুঝতে পারি, স্মরণ করছ কেউ রাত্রিদিন।

বুঝতে পারি, নিরুপায় সংকেত পাঠাচ্ছে কেউ
আলোর তরঙ্গে, অন্ধকারে।

যুদ্ধক্ষেত্রে, এখনো সহজে

রাত্রিগুলি
এখনো বাঘের মত পিছু নেয়।
স্বপ্নগুলি
এখনো নিদ্রার পিঠে
ছুরি মেরে হেসে ওঠে
সতর্ক ছিলাম, তবু কিছু চিহ্ন এখানে-ওখানে
থেকে গিয়েছিল।
পেট্রোলে-ভিজোনো ন্যাকড়া, দেশলাই-কাঠির টুকরো, এইসব।
স্মৃতিগুলি
তারই সূত্র ধ'রে হাওয়া শুঁকতে শুঁকতে, পা টিপে পা টিপে
হেঁটে আসে ; জানালার ধারে
নিঃশব্দে দাঁড়ায়।
অতর্কিতে
হো-হো শব্দ ছুটে যায় অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

অর্থাৎ এখনো মরে যাইনি। এখনো
বাতাসে পুরনো যুদ্ধ
হানা দেয়।
রাত্রিগুলি স্বপ্নগুলি স্মৃতিগুলি
চতুর্দিকে
কখনো জন্তুর মতো, কখনো দস্যুর মতো, কখনো-বা
ধূর্ত জেদী গোয়েন্দার মতো

ঘোরাফেরা করে।
অন্ধকারে
চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলতে থাকে সারাক্ষণ।

অর্থাৎ এখনো আমি বেঁচে আছি। চৌমাথায়
যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, বস্তুত আমাকে
সে-ও চোখে-চোখে রাখছে, আমি তার
হিংসার ভিতরে বেঁচে আছি।
এবং তুমিও আছ, নারী।
আছ, তাই অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে এই যুদ্ধ
কিছুটা তাৎপর্য পায়,
তাই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি এখনো সহজে
বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাওয়ায়
শব্দ করে চুম্বন রটিয়ে দিতে পারি।

দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে

দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে :
এই যে নদী, ওই অরণ্য, ওইটে পাহাড়,
এবং ওইটে মরুভূমি।
দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারের মধ্যে তুমি,
বার করেছ নতুন খেলা।
শহর-গঞ্জ-খেত-খামারে
ঘুমিয়ে আছে দেশটা যখন, রাত্রিবেলা
খুলেছ মানচিত্রখানি।
এইখানে ধান, চায়ের বাগান, এবং দূরে ওইখানেতে
কাপাস-তুলো, কফি তামাক—

দম-লাগানো কলের মতন হাজার কথা শুনিয়ে যাচ্ছ
গুরুমশাই,
অন্ধকারের মধ্যে তুমি দেশ দেখাচ্ছ।

কিন্তু আমরা দেশ দেখি না অন্ধকারে।
নৈশ বিদ্যালয়ের থেকে চুপি-চুপি
পালিয়ে আসি জলের ধারে।
ঘাসের পরে চিত হয়ে শুই, আকাশে নক্ষত্র গুনি,
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের টানা শব্দ শুনি।
মাথার মধ্যে পাক খেয়ে যায় টুক্‌রো টুক্‌রো হাজার ছবি
উঠোন জুড়ে আল্পনা, আল-পথের পাশে
হিজল গাছে সবুজ গোটা,
পুন্যি-পুকুর, মাঘমণ্ডল, টিনের চালে হিমের ফোঁটা।
একটু-একটু বাতাস দিচ্ছে, বাতাস আনছে ফুলের গন্ধ ;
তার মানে তো আর-কিছু নয়,
ছেলেবেলার শিউলি গাছে
এই আঁধারেও ফুলের দারুণ সমারোহ।
গুরুমশাই,
অন্ধকারে কে দেখবে মানচিত্রখানা ?
মাথার মধ্যে দৃশ্য নানা,
স্মৃতির মধ্যে অজস্র ফুল,
তার সুবাসেই দেশকে পাচ্ছি বুকের কাছে।

মধ্যরাতে, ঘুমন্ত শহরে

একবার…দু-বার…আমি তিনবার ভীষণ জোরে
তোমাকে ডেকেছি :
ইন্দিরা…ইন্দিরা…ইরা !
বৃদ্ধেরা শ্লেষ্মার বেগ সামলে নিয়ে উৎকর্ণ হলেন।
শিশুরা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল।
একতলায় দোতলায় তিনতলায়
অন্ধকারে তৎক্ষণাৎ খুলে গেল অসংখ্য জানালা।

কী ঘুম তোমার, তুমি বাড়িতে ডাকাত পড়লে তবু
ঘুমে অচেতন থাকতে পারো।
মধ্যরাতে পৃথিবীর তীব্রতম ডাক তাই দেয়ালে-দেয়ালে
প্রতিহত হতে-হতে
অর্থহীন হয়ে যায়।
যাকে ডাকা, সে আসে না,
অনর্থক অন্যেরা ঘরের থেকে ছুটে এসে বারান্দায়
ঝুঁকে পড়ে।

একবার…দু-বার…আমি তিনবার ভীষণ জোরে
তোমাকে ডেকেছি।
কিন্তু তার পরে আর প্রতীক্ষা করিনি।
মধ্যরাতে, ঘুমন্ত শহরে
সবাইকে চমকে দিয়ে ফিরে যেতে-যেতে আমি
দেখতে পাই,
সারি-সারি
বাতিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু পৌর ধর্মঘটের কারণে
তাতে আলো নেই।
রাস্তার দু-ধারে ছিটকে সরে যাচ্ছে আলিঙ্গনে বদ্ধ নরনারী

তখনো দূরে

রাস্তা পেরোলেই বাড়ি,
কিন্তু বাড়ি তখনো অনেক দূর।
বাবা তাঁর কাজের টেবিলে মগ্ন, এ-ঘরের থেকে অন্য ঘরে
দিদির চঞ্চল ছায়া সরে যায়,
রেলিঙে মায়ের নীল শাড়ি।
দৃশ্যগুলি একে-একে ভেসে উঠছে চোখের উপরে।
যেন সব হাতের মুঠোয়। চতুর্দিকে
শব্দ, গন্ধ, রঙের ফোয়ারা,
ফুল, লতা, অগ্নিবর্ণ পাখির পালক,
ফুটপাথের ঝক্‌ঝকে রোদ্দুর,
অর্থাৎ যা-কিছু এই ভুবনের বৃন্তে ফুটে আছে,
যা দিয়ে কবি ও শিল্পী বানিয়ে তোলেন গান, ভালবাসা,
তাকেই ব্যাকুল হাতে তুলে নিয়ে
কে তুই, নিতান্ত শিশু, বাড়িতে ফিরবার তীব্র তাড়নায়
ছুটে যাস?

রাস্তা পেরোলেই বাড়ি,
কিন্তু বাড়ি তখনো অনেক দূর।

ঈশ্বর! ঈশ্বর!

ঈশ্বরের সঙ্গে আমি বিবাদ করিনি।
তবুও ঈশ্বর
হঠাৎ আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলেন

অন্ধকার ঘর।
আমি সেই ঘরের জানলায়
মুখ রেখে
দেখতে পাই, সমস্ত আকাশে লাল আভা,
নিঃসঙ্গ পথিক দূর দিগন্তের দিকে চলেছেন।
অস্ফুট গলায় বলে উঠি :
ঈশ্বর! ঈশ্বর!

কাঁচের বাসন ভাঙে

কাঁচের বাসন ভাঙে চতুর্দিকে— ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন।
মাথার ভিতরে সেই শব্দ শুনি,
রক্তের ভিতরে শব্দ বহে যায়।
আলো নেই ঘরে।
এইমাত্র কাছে ছিলে, অকস্মাৎ গিয়েছ কোথায়,
আমি কিছু বুঝতে পারি না।
শুধু শুনি,
চতুর্দিকে শব্দ বাজে ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌ ;
শুধু দেখি,
পেয়ালা পিরিচ
ভয়ার্ত পাখির মতো ছুটে যায় জ্যোৎস্নার ভিতরে।

সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত

বায়বীয় চাঁদকে নিয়ে
এই আমাদের
শেষ কবিতা, আমরা লিখে দিলাম।
সময়ের জল-বিভাজিকায় দাঁড়িয়ে
মানবীয় চাঁদকে নিয়ে
এই আমাদের প্রথম কবিতা।

দূর থেকে চাঁদকে যাঁরা ভালবেসেছিলেন,
সেই প্রাচীন কবি ও প্রেমিকদের আমরা
শেষ বংশধর।
কাছে গিয়ে তার মৃত ওষ্ঠে যাঁরা
প্রেমে-প্রত্যয়ে-সংশয়ে-দ্বিধায় আলোড়িত
জীবনের
তপ্ত চুম্বন স্থাপনা করবেন,
সেই নবীন কবি ও প্রেমিকদেব আমরা
জনক।
আমরাই সমাপ্তি, এবং
আমরাই সূচনা।

একটা কল্প শেষ হয়ে গেল
(কল্প, না কল্পনা ?),
আজ
আর-এক কল্পের আরম্ভ।
একটা ভাবনা শেষ হয়ে গেল,
আজ
আর-এক ভাবনার শুরু।

দুই কল্পের, দুই ভাবনার, একই জন্মে দুই জীবনের
মিলন-লগ্নে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

দেখতে পাচ্ছি—
আমাদের একদিকে আজ পূর্ণগ্রাস,
অন্যদিকে পূর্ণিমা।

চতুর্থ সন্তান

দুটি কিংবা তিনটি বাচ্চা, ব্যস্‌!
সভ্যতার সায়ংকালীন এই স্লোগানের অর্থ বুঝে নিয়ে,
চতুর্থ সন্তান, তুমি ঘরের ভিতরে
দেয়ালের দিকে মুখ রেখে
গুম হয়ে বসে আছ।
ক্রোধে, নাকি দুঃখে, নাকি অবজ্ঞায়?
আয়ত চক্ষুর মধ্যে কখনো বিদ্যুৎ-জ্বালা খেলে যায়,
কখনো মেঘের ছায়া নেমে আসে।
তোমার বিরুদ্ধে আজ জোটবদ্ধ সমস্ত সংসার.
তবুও চেয়েছ তুমি তাকে,
যে তোমাকে চায়।

কে তোমাকে চায়?
পথে-পথে নিষেধাজ্ঞা, দিকে-দিকে নিরুদ্ধ দুয়ার।
অবাঞ্ছিত ফল,
অসতর্ক মুহূর্তের ভ্রান্তির ফসল,
চতুর্থ সন্তান, তুমি কার?

দুটি কিংবা তিনটি বাচ্চা, ব্যস্‌!
অপমানে বিকৃত মুখের রেখা, সভ্যতার চতুর্থ সন্তান,
হঠাৎ কখন তুমি ঘর থেকে উন্মাদের মতো
রাজপথে

বেরিয়ে এসেছ,
বন্দুক তুলেছ ওই বিদ্রূপের দিকে!
জনতা ও যানবাহন থেমে যায়, প্রতিষ্ঠানগুলি
আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে।
হয়ত বুঝেছে তারা,
আসন্ন দিনের যুদ্ধে তুমিই তাদের
সব থেকে ক্ষমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বী;
হয়ত জেনেছে,
যে-পৃথিবী তোমাকে চায়নি,
তুমিও অক্লেশে তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারো।

কলকাতার যীশু

লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে-ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল;
ভয়ঙ্করভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাকসি ও প্রাইভেট, টেম্পো, বাঘমার্কা ডবলডেকার
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দু-দিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল—
ঝাঁকামুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানী ও খরিদ্দার—
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মতো শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টাল্‌মাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।

খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়।
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে ;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।

স্টেটবাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারী-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষটানি.
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই ;
দু-দিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টাল্‌মাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।